মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪ (২২শে কার্ত্তিক)
৯ই নভেম্বর, ২০০৭

মুদ্রণে ঃ-
মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট
কোলকাতা - ৭০০০০১

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in, ফোন ঃ- ৯৩৩০৯৮০৪২৩
২) ২৯১ এস. কে. দেব রোড, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
৩) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক - বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

রোগ, শোক, দুঃখ, ব্যথা, জ্বালা-যন্ত্রণা, হতাশা নিরাশাকে সাথী করে নিজেদের অজান্তে জীবজগৎ দুরন্তগতিতে এগিয়ে চলেছে মহাশূন্যের মহাচেতনার সাগরে মিলিত হওয়ার লক্ষ্যে। তাই প্রতিটি জীবের সাধনাই হচ্ছে মহাশূন্যের সাধনা। শূন্যকে আশ্রয় করে জীবজগৎ সৃষ্ট হয়ে আবার শূন্যতে লয় হয়ে যাচ্ছে। জীবের জন্ম-মৃত্যু আপাত দৃষ্টিতে প্রত্যক্ষ করলেও প্রকৃতপক্ষে জীবের জন্মও নেই, মৃত্যুও নেই। শুধু যুগযুগান্ত ধরে আবর্ত্তনে বিবর্ত্তনে রূপে রংএ রসে, বর্ণে গন্ধে স্পর্শে পরিবর্ত্তনের সুরে পরিবর্ত্তিত হতে হতে চলেছে জীবজগৎ মহাশূন্যের অনন্ত সুরের ধারায় মিলিত হবার বাসনায়।

এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু রূপ, সবই মহাশূন্যের রূপ। অথচ মহাশূন্য চিরকালই ফাঁকা; চিরকালই নিরাকার; কোন রূপের বর্ণনায় তাকে বর্ণিত করা যায় না। মহাশূন্য চিরকালই শূন্য। আবার সেই মহাশূন্য হতেই অনন্ত গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য, চন্দ্র ও অগণিত রূপগুণ বিশিষ্ট সৃষ্টি হল এই মৃণ্ময় পৃথিবী। মহাকাশে বা মহাশূন্যেই রয়েছে মন, প্রাণ, চৈতন্য; রয়েছে বিশ্বের আদিসুর, আদিশব্দ বা ধ্বনি। শূন্য চিরকালই ফাঁকা। আবার ফাঁকার মাঝেই রয়েছে সব আঁকা। এমনি খুঁজতে গেলে কোন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না। আবার 'নাই' বা ফাঁকার সত্তাকে খুঁজলেই সবার সত্তাকে খুঁজে পাওয়া যায়। শূন্য মানেই পূর্ণ। তাকে খোঁজে আনার জন্যই এই জীবজগতের সৃষ্টি। বাস্তব জগতের অপরূপ সৃষ্টির মধ্য দিয়েই তাকে খুঁজতে হবে। খুঁজতে হবে তার আদিসুর ও সাড়াকে।

মহাশূন্য মহাচেতনায় ভরপুর। সর্বত্রই রয়েছে তার মহাচেতনার প্রকাশ। মহাসচেতন মহাশূন্যের চৈতন্যের কণাগুলি প্রতিনিয়ত আমাদের মধ্যে সাড়া জাগিয়ে আবার মহাশূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে। মননের মন্থনে সেই চৈতন্যের কণাগুলোকে যদি জমাট বাঁধিয়ে নিতে পারা যায়, তবেই মহাশূন্যের মহা সুরকে আয়ত্ত করা যাবে। এই পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু আবিষ্কার, তা এই চৈতন্যের কণার সুরগুলিকে মন্থন করেই।

মহাশূন্য নিজেকে, নিজের স্বরূপকে, নিজের বিরাটত্বকে প্রকাশ করছেন জীবজগৎ সৃষ্টির মধ্য দিয়ে। শূন্যই স্বয়ং মহাচৈতন্যের স্বরূপ। মহাশূন্য যে মহাচৈতন্যে ভরপুর, সেই চেতনাই বুঝ হিসাবে, বুদ্ধি ও মন হিসাবে প্রতিটি জীবের মধ্যে বিদ্যমান। তারই সত্তা প্রতিটি জীবের মধ্যে বিদ্যমান। তারই সত্তা প্রতিটি জীবের মধ্যে স্পন্দিত হচ্ছে। একই সুর আলাদা আলাদাভাবে জীবজগতের মাঝে সাড়া দিচ্ছে। এই যে এক থেকে বহু, আবার বহুর মাঝে একত্বের সুর ও সাড়া, এটাই কি মহাশূন্যের মহান সৃষ্টির অপার রহস্য?

শূন্য থেকে জীবজগতের সৃষ্টি বলেই শূন্যের অবস্থাটা নানাভাবে আমাদের মাঝে প্রকাশিত হচ্ছে। আমাদের মধ্যে এত সমস্যা, এত দ্বন্দ্ব, এটা হচ্ছে সেই শূন্যেরই প্রভাব। যে শূন্য হতে এই পরিদৃশ্যমান জীবজগত, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র সবাই দুলছে অনন্ত সমস্যায়। আমাদের এই দেহ মহাশূন্য হতে সৃষ্টি হয়েছে বলেই আমরাও রোগ শোক, দুঃখ দৈন্য, ঘাত প্রতিঘাতের সমস্যায় দুলছি।

স্রষ্টা রয়েছেন আমাদেরই মাঝে। আমাদের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তারই শক্তির বিকাশ হচ্ছে। মহাকাশে যে অনন্ত সুর ও সাড়া আছে, চৈতন্য ও বুঝ আছে, সেটাই জীবজগতের সবাই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করছে, মাত্রামাফিক যার যার দেহযন্ত্রের মাধ্যমে। সবাই আমরা এখানে এসেছি মহাশূন্যের সুর ও সাড়া নিয়ে। জীবিত থাকাকালীন দেহস্থিত বুঝ ও চৈতন্যের কণাগুলি মনের মন্থনে মন্থনে যদি জমাট বেঁধে নিতে পারে, তবে মৃত্যুর সময় সেই সত্তাটা নিজস্ব একটা সত্তা ও বুঝ নিয়ে বেরিয়ে গিয়ে স্ব-ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে চালিত হতে পারবে এবং জন্ম-মৃত্যুর ঊর্দ্ধে থেকে চিরকাল চিরযুগ মহাশূন্যে অনন্তক্ষমতা, অনন্তশক্তির অধিকারী হয়ে বিচরণ করতে পারবে।

প্রকৃতির নিয়মে সবাই আমরা মহাশূন্যের মহা সুরের সাথে মিশেই রয়েছি। আবার এগিয়ে চলেছি মিশে যাবার প্রচেষ্টাতে। মৃত্যু যেমন অবধারিত, মহাশূন্যের মহাসুরের সাথে সবার মিলনও তেমনই অবধারিত। তবে কারও হাঁটাপথ, কারও বা রেলপথ, কারও আবার প্লেন বা স্পুটনিকের পথ। প্রকৃতির সেই অনন্ত গতির সাথে সহজে মিশিয়ে দেবার জন্যই গুরু। গুরু পরম গতিদাতা। জন্মসিদ্ধ মহানের সাথে যোগাযোগ থাকলে, তাঁর আদেশ নির্দেশ শিরোধার্য করে চললে, তত্ত্বের গভীরতায় ডুবে থাকলে, শত বাধা বিপত্তি থাকা সত্ত্বেও মহাশূন্যের মহাচেতনার সাগরে মিশতে দেরী হয় না। তা না হলে এই পৃথিবীর আকর্ষণ কাটিয়ে মহা সুরের সাথে মিশে যাওয়া বড়ই কঠিন।

মহাশূন্যের মহাচেতনার সাগরে সবাই যাতে সহজে মিশতে পারে, সেই উদ্দেশ্যে জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনো ঘরোয়া পরিবেশে কখনও বা বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমত তাঁর সেই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই ইচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। তাঁর ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে, তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে অভিনব দর্শনে'র সপ্তদশ শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল **'মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর'**।

পরিশেষে জানাই পরমপিতা জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের তত্ত্ব ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন শ্রী অনির্বাণ জোয়ারদার, শ্রী দেবতনু চক্রবর্ত্তী, করুণাময় চ্যাটার্জী, । এছাড়া যে সকল ভক্ত ও গুরুগত প্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪ — *চপল মিত্র*
৯ই নভেম্বর, ২০০৭ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

বিরাটের বিরাটত্ব শূন্যেই বিরাজ করছে

৪৬ নং ভূপেন বোস এভিনিউ,
শ্যামবাজার, কোলকাতা
১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭

কি অবস্থায় থাকতে হবে, সেটা ভেবে নিয়ে কাজে নামতে হবে। স্বাভাবিক আইনের সাথে যে নিজের আইন, সেই আইনের সঙ্গে সমন্বয় রাখাই হচ্ছে কাজ। এই স্বভাবই প্রকৃতির প্রকৃতস্থ রূপ। প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী এই স্বরূপের স্বরূপত্ব আগে জানা দরকার। যাঁরা জন্মগত সিদ্ধ তাঁদের দর্শনের প্রতিষ্ঠা হয় না। প্রতিষ্ঠা করতে গেলে কত গোলমাল অবস্থার মধ্যে পড়তে হয়। প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ রাখতে গেলে প্রাকৃতিক নিয়মে চলতে হয়। শাস্ত্রজ্ঞরা কখনও ভগবানকে স্বীকার করছেন, আবার বলছেন নেই। এই 'আছে' এবং 'নেই' জন্মগত মহানের বেলায় প্রযোজ্য হয়। যে জিনিসটা আছে, খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়ে সেটাই নাই। আবার 'নাই' হতে আরম্ভ করলে 'নাই'-এর মাঝেই 'আছে' হয়ে রয়েছে এই জগৎ, এই অনন্ত গ্রহনক্ষত্রপুঞ্জ।

পূর্ণতাকে পূর্ণবিকাশ করা যায় পূর্ণবেগে ধাবিত হলে। অস্তিত্ব আর অস্তিত্বহীন, এই যে দ্বৈত (দুই) মত, তার মীমাংসা হয় কিভাবে? শূন্যচিন্তা সজ্ঞানে যখন কর, তখনই জন্ম; জন্মটাই মৃত্যুর আভাষ। এও শেষ নয়। শেষ হচ্ছে ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোমে। যখনই জন্ম হয়, তখনই বলা যায়, তিনি পঞ্চভূতে মিশে আছেন। ক্ষিতি, অপ্, তেজের আকার রয়েছে এক ব্যক্তির মধ্যে। আবার ক্ষিতি, অপ্, তেজই শেষ নয়। এই ব্যক্তি এসেছে অগণিত ভূতের সমষ্টি হতে। প্রথম হতে এক ব্যক্তিকে সূত্র

ধরে ধরে ভাগ করতে করতে গেলে দেখবে, শেষ নেই। কাজেই যার শেষ নেই, তার 'অস্তিত্ব নেই', এটা হতে পারে না। বস্তুর বস্তুত্ব কোথায়? তাহলে বস্তুর বস্তুত্ব শূন্যে। বস্তুর বস্তুত্ব শূন্যে ব্যাপ্ত। যা শূন্যে ব্যাপ্ত, তা শূন্যকে ছাড়িয়ে যেতে বা অতিক্রম করতে পারে না। কাজেই শূন্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে সমস্ত বস্তু এবং সেখানে শেষবার যখন একটির সন্ধানে উপস্থিত হবে, বস্তু খুঁজতে খুঁজতে তখন দেখবে, বস্তুর বস্তুত্ব শূন্যে লীন। শূন্যের অস্তিত্বে বস্তুর বস্তুত্ব বিরাজিত। প্রতিটি বস্তুই শূন্যকে আঁকড়িয়ে নিজের মনোবল এবং গতিকে Maintain করছে এই শূন্যে। কাজেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব শূন্যময় হয়ে গেল। আমিত্ব আছে চিন্তা করেও শূন্যতেই যেতে হচ্ছে। আবার আমিত্ব আছে চিন্তা না করেও শূন্যতেই যেতে হচ্ছে। তাহলে বস্তুর বস্তুত্ব শূন্যেই শেষ হয়ে গেল। শূন্যেই শেষ; এখনও পর্যন্ত তাই দেখা যাচ্ছে। যার মধ্যে ব্যাপ্ত হয়ে আছে, যে ফাঁকাতে ঝুলে আছে, সেই ফাঁকার ধ্যানই শূন্যধ্যান। কিভাবে ফাঁকাতে থাকতে হবে, তারজন্যই যোগাযোগ, তারজন্যই ধ্যান। **বিরাটের বিরাটত্ব শূন্যেই বিরাজ করছে। শূন্যেই অগণিত জিনিস পড়ে আছে, খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। তাহোক, শূন্যেই আমরা একটা অবস্থায় আছি। ইন্দ্রিয়ের চাহিদা ফাঁকার Influence-এ ফাঁকা হয়ে গেছে। একটা gap আছে আমাদের মধ্যে। সর্বদা তা পূরণ করতে চাইছি। এই gap বা ফাঁকা না থাকলে মিটে যেত। এখন কোন দিক দিয়েই মিটছে না। যে পর্যন্ত না মিটছে, পূরণার্থে ইন্দ্রিয়ের চাহিদা এগিয়ে চলেছে।** মরুভূমিতে যত জল দাও, শুষে নিচ্ছে। সেইরূপ আমরা পূরণের জন্য যা কিছু করছি, উড়ে যাচ্ছে। কাজেই এই আভাষ কি শেষ আভাষ? এই দর্শন, শ্রবণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের চাহিদা মিটানোর আকর্ষণেই ধ্যান। যে যে লাইনে গেলেন বা যাচ্ছেন, তা ঐ আকর্ষণেই যাচ্ছেন। যে যেভাবে যাক না কেন, কাজ করুক না কেন, নির্বাণেই যাক, দর্শনেই যাক আর গুণাতীত বা ভাবাতীতেই যাক, চাইছে সবাই। এই যে তৃষ্ণা সকলেরই আছে। তাতে বুঝা যায়, যার ভিতর আমরা বিরাজ করছি, তা ফাঁকা। শূন্যেতে আছি বলে একে অন্যের আকর্ষণে চুম্বকত্ব হয়ে গেছে।

এই যে চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আসছে কোথা থেকে? বস্তু হতেই এইরূপে নানারূপে পরিবর্ত্তনের ধারায় রূপে, রূপে, রূপান্তরিত হয়ে চলেছে।

তবে শেষ বস্তুতো একটা আছে। কিন্তু সেই এক কোথায়? কাজেই যার মীমাংসা হয় না, তা শূন্যেই আছে। যে **বিষয়বস্তু যত বড়ই হোক, তা তোমার ধারণার মধ্যেই থাকবে। বিষয়বস্তু ধারণা করবার মত সবই দেহের বা ইন্দ্রিয়ের Parts-এর মধ্যে আছে। যে জিনিস চিন্তা করতে করতে ফাঁকায় চলে যাচ্ছে, তা অসীমের মাঝে, সীমাহীনের মাঝে চির বিলীনের পথে লীন হয়ে যাচ্ছে।** তাকে আর বের করে আনার দরকার নেই যে, ফিরে এস। এই খেই হারানোটা হচ্ছে শূন্যের এক অবস্থা। কাজেই এই শূন্যই তোমার চিন্তার বস্তু। যেটা ফাঁকা লাগছে, সেটাই তোমার চিন্তা। ভাল লাগে না বলে লোকের যে দুঃখ, সেটাও ফাঁকা। বিশ্বপ্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী তার গতি আপনমনে আমাদের ভিতর প্রবাহিত হচ্ছে। ইহা হচ্ছে, Natural course, ইহা নৈসর্গিক, ইহা সহজাত। সবার ভিতর ইহা আছে। এই প্রাকৃতিক নিয়মটা ধরেই আমরা আরও এগিয়ে চলেছি। সেইটাই ধ্যান। ধ্যায়েচ্ছূন্যমহর্নিশম্। এই বিষয়বস্তু নিয়েই চিন্তা করতে করতে তুমি কেন্দ্রস্থলে পৌঁছে গেলে, শূন্যে চলে গেলে।

Wall-এর জন্য বাধা পেয়ে পেয়ে আমাদের দৃষ্টিশক্তি কমে গেছে। সবকিছুতেই যদি একটা মুক্ত অবস্থা থাকে, তবেই খুব ভালো হয়। কারণ মুক্ত জায়গায় মনের বিচরণ। জীবজন্তু সবাই চায় সবসময় মুক্ত চিন্তা করতে। পার নাই, কুল নাই, সম্বল নাই আপনমনে চলেছে। নীচু হতে কিছু টানতে গেলেই ফোঁপাইয়া ওঠে। জলটা Pump করে উপরদিকে টানলেই ফোঁপাইয়া ওঠে অর্থাৎ সেইমুখী হয়ে যায়। **মুক্ত জায়গায় চিন্তা করলে এইভাবে ভিতরের Gland গুলি ফেঁপে উঠবে এবং ইহার পর প্রসব করে সেই মহাশক্তি। যে শক্তিতে এই সৃষ্টি হয়েছে, সেই ক্ষমতা তখন ভিতরে এসে হাজির হয়। দেহবীণাযন্ত্রের সমস্ত gland গুলো ফুলে উঠে একটা চাহিদার মধ্যে যেতে থাকে।** Free hand exercise আছে। Instrument-এর সাহায্যে যা হয়, Free-hand-এও তাই হয়। এই যে মনে মনে ব্যায়াম, তাতে কয়েকদিন পরে তোমার দেহও সেইভাবে বাড়তে থাকবে। Instrument (যন্ত্র) নিয়ে করলে যেমন হয়, মনে মনে যে ব্যায়াম, ইহাতেও same (একই) পরিশ্রম হয়। Mind-এর সাহায্যে ঐ চিন্তায় চিন্তায় দেহ গড়ে ওঠে। মনে কর, তুমি G.T. Road দিয়ে দৌড়াচ্ছ। খানিক পরে

দেখবে, তোমার ঘাম বেরিয়ে গেছে। সেইরূপ শূন্যচিন্তাও একরূপ ব্যায়াম। এত Speed-এ Mind চলে যাচ্ছে যে, আগুনের বা তাপের রেশের ন্যায় সমস্ত Gland-গুলো সতেজ হয়ে উঠতে থাকে। এতবড় বিরাট গতির মনকে তুমি বাড়িঘর অর্থাৎ টোফামুচি (খেলনা) দিয়ে শান্ত রাখতে চাইছো। কিন্তু তাতে এর কি হবে? শূন্য চিন্তার জায়গায় গেলে 'এ' (মন) বাষ্পের ভিতর ফোকাস ফেলে খাবার জোগাড় করে নেয়। একপ্রকার জীব দূর থেকে রক্ত চুষে খাবার সংগ্রহ করে। ছোট ক্যামেরার ভিতরে বিরাট জায়গার ছবি ওঠে। মনও শূন্যচিন্তায় ওর (মনের) Real food খায় এবং ফোঁপাইয়া ওঠে। কাজেই ফল হয়। গাছ হলেই ফুল ফল হয়। মনে কর, একটা জিনিস মুখে ছিল। ফেলবার জায়গা নেই। মুখে আটকে গেছে, ফেলার উপায় নেই। ফেলে দিলে রেহাই পেলে। সেরূপ ভিতরে ভিতরে চিন্তার একটা বেগ হয়, না ফেলা পর্যন্ত। ওটা (মনের গতি) আর ক্ষান্ত হয় না। নিজে রেহাই পাবার জন্য ফল ফলতে লাগলো। Universe-এ প্রথম চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র ফললো নিবৃত্তির দিকে যাওয়াতে। নিবৃত্তি যখন হয় নাই ধোঁয়া আকারে ক্ষমতাটা বের হতে লাগলো। অগণিত সৃষ্টির রূপ দেখা যেতে লাগলো।

সেইরূপ আমাদের শেষ নাই। বৃত্তির নিবৃত্তি সবসময় চলেছে। এই জগৎপ্রপঞ্চ সব সময় বিরাম বিহীনের গান গেয়ে চলেছে। কেহই ক্ষান্ত হয় না। কিছু কিছু বোধ হয়, বিশ্রাম হয়। তার অর্থ এই নয় যে, অন্তরের ক্ষুধা নিবৃত্ত হয়ে গেছে। সেইরূপই ফল হয়, যেরূপ চেষ্টা করছো, ঠিকই পাচ্ছ। অসংখ্য রকমের চিন্তা এখানে করা হচ্ছে। আকামে কুকামে যুদ্ধ, হিটলারের মারামারি এখানে। সবকিছু নিয়েই ঝগড়াঝাঁটি, Energy কিন্তু loss হচ্ছেই। একটা ষ্টীমার দাঁড়িয়ে থাকলেও Gas ছাড়ে। আসলে মনের কতগুলি রোগ আছে। ক্ষুধার বেলায় নিজের ঠ্যাং খায়। অন্যে মারতে আসছে ভেবে আরও তাড়াতাড়ি খেতে খেতে নিজেরই একটা ঠ্যাং শেষ করে ফেলেছে। আমরা সেইরূপ নিজেদের খেয়ে ফেলছি নানারকম চিন্তায়। **ট্রেনে, বাসে, ট্রামে নিজেদের সবক্ষমতা অপব্যবহারে শেষ করে ফেলছি। নিবৃত্তি আর হয় না। নিবৃত্তি করতে হলে উঠতে হবে। ওখানে গেলে উঠে যাবে। এখানকার সবই হবে। বিয়ে হবে, ছেলেপুলে হবে, কিন্তু**

তার উর্দ্ধে উঠে যাবে। এগিয়ে যাওয়াতে এগুলি আর অন্তরায় হবে না। গরুর গাড়ীতে যে যায়, সে শেষ পর্যন্ত ধুলা খেতে খেতে যায়। ট্রেনে গেলে একটু কম ধুলা খেতে হয়। আর Plane-এ গেলে এখানকার সব অবস্থা দেখে। কিন্তু কিছু স্পর্শ করতে পারে না। আপন গতিতে চলে যায়।

কি পেলে, না পেলে ভাববে না। হতাশায় বসে পড়বে না। খাওয়ার সময় কেউ কি নিজে এই হজম ক্রিয়া করছে? এই শূন্য চিন্তারও উদর আছে। এমনি তো পঞ্চভূতে যাচ্ছেই। মিলতে তো হবেই। কাজেই আগে থেকেই তাকে ধরবো কেন? শূন্যচিন্তা করলে এখানকার সবই থাকবে। ছেলেপুলে, স্বামী-স্ত্রী, মা বাবা সবই থাকবে। কিন্তু একটা গুরুগম্ভীর শান্তভাবে সবকিছু হবে। কেমন করে বসবে শূণ্যচিন্তাতে? অন্ধকার ঘরে বস না কেন? **রামচন্দ্রপুরের এক ভক্তকে স্বপ্নের মধ্যে ধ্যান করতে বলেছিলাম। সে স্বপ্নের মধ্যে সমস্ত কাজ আরম্ভ করলো। Hospital যাওয়া, Conference attend করা, ছেলেপুলে নিয়ে সংসার করা, শূন্যে গমন, জলের উপর দিয়ে হাঁটা স্বপ্নের মধ্যে সব হচ্ছে। বছরখানেক পরে সে স্বপ্নের মধ্যে আর একটা স্বপ্ন দেখছে। জেগেও সে মনে করছে, সে স্বপ্ন দেখছে। সে শূন্যে উঠে যাচ্ছে।** তার আত্মীয়স্বজন এই অবস্থা দেখে তাকে ধরে নামালো। তারপর সে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। স্বপ্নে যে মন হোত, জেগেও তাই হয়। স্বপ্নে Mind-টা খুব sensitive থাকে। এইটা জাগ্রত অবস্থায় Maintain করলেই সবকিছুর অধিকারী হওয়া যায়। এইজন্যই Meditation, এইজন্যই ধ্যান। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই রয়েছে সবাই

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬
সুখচর ধাম

হাজার হাজার বছর আগে বেদজ্ঞদের কাছে পাহাড় ভেঙে পাথর ভেঙে তত্ত্বপিপাসুরা আসতেন ২৫/৩০ মাইল দূর থেকে তত্ত্ব শোনার জন্য। ভক্তরা জ্ঞানপিপাসুরা আসতো জ্ঞান সংগ্রহের জন্য। তারা কি কষ্ট করতো, ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরতো। হায়না, বাঘ, সিংহ, সর্পের ভয় ছিল। তবু তত্ত্বপিপাসু সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে আসতো। কেউ কেউ আর বাড়ী ফিরতে পারতো না। ওদের কবলে পড়ে যেত। তবু তারা যেত, তত্ত্ব সংগ্রহ করে গ্রন্থ রচনা করবার জন্য। সেই গ্রন্থের কিছু কিছু আমাদের কাছে এসে পৌঁছে। সেসব গ্রন্থ এখন অনেক মনগড়া হয়ে গেছে। আগের সেই তত্ত্ব দর্শন এখন ঠিকমত পাওয়া যায় না। যা পাওয়া যায়, সেই গ্রন্থও সঠিক নয়। অনেক আগুনে পুড়ে গেছে, ঝড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। শত্রুরা নষ্ট করেছে। সে যাই হোক। **তত্ত্ব কোনদিন নষ্ট হয় না। দর্শন কখনও নষ্ট হয় না। যতদিন পর্যন্ত চন্দ্র, সূর্য আছে, পৃথিবী আছে, জগৎ আছে, ততক্ষণ তত্ত্বও আছে। এগুলি হল তত্ত্বের প্রকাশ। জগৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড 'এ' থেকে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এ থেকেই তত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে। এ থেকেই তত্ত্বের প্রকাশ হয়েছে।** তত্ত্বজ্ঞরা এ থেকেই বিশ্লেষণ করে করে তত্ত্বের অন্তর্নিহিত সুর এবং সাড়া খুঁজে পেয়েছেন; সবার কাছে তুলে ধরেছেন। হাজার হাজার, লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি, কত অগণিত জীব চলে গেছে। কত আমাদের পূর্ব-পুরুষরা চলে গেছেন, তা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তাদের তো আমরা চিনি না, জানি না— কোথায় আছেন জানি না। শুধু জানি, আমরা যখন আছি, তাঁরা ছিলেন। 'আছি' যখন, নিশ্চয়ই ছিলাম। নিশ্চয়ই ছিলেন তাঁরা, তা না হলে 'আছি' কি করে হয়? যাঁরা ছিলেন, কতদিন ছিলেন, তা জানি না। তাঁরা চলে গেছেন অনন্ত সুরে অনন্ত ধারায় অনন্ত ধামে। এই মহাশূন্যে কে কোথায় লীন হয়ে গেছেন, তা জানা নাই। এই

অনাদি অনন্ত মহাশূন্য, মাঝে— কি থেকে এই জগৎ এসেছে, বলা যায় না। কোথা থেকে এসেছে, কিভাবে এসেছে, তাও বলা যায় না। শুধু জানি 'ছিল'। কোথায় 'ছিল' জানি না। কিভাবে ছিল জানি না। যখন আসলো, তখন বোঝা গেল, 'আছে', নিশ্চয়ই ছিল। তা না হলে কিভাবে এল? কেমন করে ছিল, কেমন করে কোথায় এগুলো ছিল? কোথা থেকে উদ্ভব হল? কি করে এল এই জীবজগৎ? এই পৃথিবী প্রথম এবং আদিতে কিভাবে গঠন হল এবং কাজে ব্রতী হল? কি করে বস্তু আসলো? বস্তুর আগে বস্তু কোথায় ছিল? একটা বস্তু তো থাকবে। আদি চিন্তা করলে এর আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। শুধু এইটুকুনু পাওয়া যায়, বস্তু খুঁজতে গেলে বস্তুত্বের বস্তু থাকবেই। সুতরাং সেই বস্তুর সন্ধানে গেলে সন্ধান যখন পাওয়া যায় না, তাহলে বস্তুই আদি নয়। আদি থাকলে একটা আদি খুঁজে পাওয়া যাবে। আদি যখন নেই, তখন আদি নিশ্চয়ই এর ছিল না। আদি থাকতে পারে না। আদি থাকলে আরম্ভ থাকবে। এর কোন সূচনা নাই, সূত্র নাই, ধারা নাই। সুতরাং 'নাই'-এর মাঝেই এই মহাশূন্যই যার পাত্র, যার আদিও নাই, অন্তও নাই, ধারা নাই, যার সৃষ্টি নাই, সৃষ্টি থাকতে পারে না। কারণ সৃষ্টি করতে গেলেই একজন ব্যক্তি থেকে যায়। সেই ব্যক্তিও নাই। সুতরাং শূন্য কেউ সৃষ্টি করে নাই। অনন্ত যুগের শূন্য, আজও সেই শূন্য। এই শূন্যই দেখতে পাচ্ছি সচেতন।

শূন্য যদি সচেতন হয়ে থাকে, সেই শূন্য থেকেই পূর্ণ হল, এই জীবজগতের সৃষ্টি শুরু হল। কারণ শূন্যের তো আদি নাই, কেউ সৃষ্টি করে নাই। এই শূন্যের স্থান অসীম, এর শেষ নাই। শূন্যের যখন শেষ নাই, এর সৃষ্টিও অসীম, অনন্ত। তারও শেষ নাই। কোনটারই শেষ নাই, সৃষ্টির কোনটারই শেষ নাই। বুঝতে হবে, এই বস্তুর বস্তুত্বের অস্তিত্ব— অসীম। এই সৃষ্টি কে করলো—তার আদিও নাই। মনে হয়, এই শূন্যের শেষ যেদিন খুঁজে পাওয়া যাবে, সেদিনই এর আদিও খুঁজে পাওয়া যাবে। তার আগে পর্যন্ত শূন্যের আদিও নাই, অন্তও নাই। মহাশূন্যের আদি কেউ খুঁজে পায় নি। তাই অন্তও কেউ খুঁজে পাবে না। মহাশূন্যে শূন্যময় জগতে অনন্ত কোটি গ্রহনক্ষত্রের পথে চলছে সবাই অনন্তকাল ধরে। তারা আজও পায়নি তার সমাধান। যেখানে ছিল প্রথমদিন, আজও মনে হয় গ্রহগুলি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে। কোনও কোনও গ্রহ অগণিত কোটি মাইল বেগে চলছে, হাজার হাজার কোটি কোটি বছর যাবৎ,

আজও চলছে গতির পথে। যদি জিজ্ঞাসা কর সেই গ্রহকে, 'তুমি কতকাল যাবৎ এইভাবে চলছো? বলছে, যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার লক্ষ কোটি বছর ধরে, আমি অনন্তকাল অনন্তগতির পথে চলছি এই মহাশূন্যের যাত্রিক হয়ে। আজও এর দিশ পেলাম না। মনে হয়, সেই প্রথম দিনের মত আজও সেই অনন্তগতির পথেই ছুটে চলেছি। আজও সেই একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। সেই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি বছর যাবৎ সেইভাবে ছুটে চলেছি। আজও সেইভাবেই ছুটে চলেছি। সেদিন থেকে মনে হয় একজায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু এর শেষ কোথায়?

এখন চিন্তা করে দেখ, সমস্ত গ্রহ, অগণিত গ্রহ একই সুরে প্রবাহিত হয়ে অনন্তগতির পথে অনন্তধারায় চলছে চলছে চলছে। তাই আদি নেই। কোন শাস্ত্রজ্ঞরা, কোন ঋষিরা, কোন তত্ত্বজ্ঞরা কোন দেবতারা, তার (শূন্যের) আদি খুঁজে পায়নি। আদির সমাধান করতে পারেনি। তারা ছেড়ে দিয়েছে— ছেড়ে দিয়েছে এর সমাধান মহাশূন্যের বুকে। এই অনন্তগতির অনন্ত পথের পথিকের খোঁজ কেউ পায়? পেতে পারে না। আজও কেউ তার সমাধান করে উঠতে পারেনি। কেন সমাধান করতে পারেনি? সবকিছুর সমাধান আছে, মীমাংসা আছে। মিলিয়ে দেওয়া যায়। **অঙ্ক আছে। গণিত যখন আছে, তখন তার একটা মীমাংসাও আছে। কিন্তু গণিতে ফলগণনায় গণিত শেষ হয়ে গেল। যুক্তি গণনায় যুক্তি শেষ হয়ে গেল। বিজ্ঞানের ধারায় তার ধারাপাতা শেষ হয়ে গেল। সমস্ত যুক্তি, সমস্ত নীতি, সমস্ত, সবকিছু যখন শেষ হয়ে গেল, আর যখন নাগাল পাওয়া যাচ্ছে না, তখন মাথায় হাত দিয়ে সবাই বললো, সবাই একটি কথা বললো, আমরা আর পারছি না। এর যে কোথায় শেষ, আমরা আর ধরতে পারছি না।** আমাদের বিজ্ঞানের চিন্তায়, আমাদের গণিতের চিন্তায়, আমাদের যুক্তির চিন্তায়, আমাদের বুদ্ধির চিন্তায় আর নাগাল পাচ্ছি না। সুতরাং এখানে দাঁড়ি টেনে দিচ্ছি। কবে হবে এর সমাধান জানি না। যেদিন হবে, সেদিন বলবো, সেদিনকার কথা। সেদিন পাব সত্যিকারের হদিশ। এখন পর্যন্ত খোঁজের মাঝে নিখোঁজ হয়েই রয়েছে সবাই। যতটুকু আমরা পাচ্ছি বাস্তবের সুর, বাস্তবের কথায় বার্তায়, ভাবে ভঙ্গীতে যা পাচ্ছি, এই পাবার ভিতরেও কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি মহাশূন্যের রূপ। প্রতিটি কাজে, প্রতিটি চলায়, প্রতিটি বস্তুতে, প্রতিটি চিন্তায় শূন্যের প্রভাব আমরা উপলব্ধি করছি। আমাদের

খাওয়ায় দাওয়ায় বল, চলায় বল, আমাদের চাওয়ায়, গানে সর্বত্র সর্ববস্তুতে, আমাদের চোখে মুখে সব সময় চলছে একটা শূন্যের প্রবাহ; মহাশূন্যের প্রভাব। আমাদের প্রতি অঙ্গে প্রত্যঙ্গে ভাবে ভঙ্গিমায় আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে উপলব্ধি করতে পারছি এই মহাশূন্যকে। এর কারণ খুঁজতে গেলে কারণ খুঁজে পাই না। একটা দিয়ে আরেকটা মিলাই, আরেকটা দিয়ে আরেকটা মিলাই, আরেকটা দিয়ে আরেকটা মিলাই। মিলাতে মিলাতে শত সহস্র পর্যন্ত, বহুদূর পযন্ত মিলাতে পারি, তারপরে মিলাতে গেলে আর মিলতে চায় না। আর বুঝতে পারি না। কি করে যে এটা আসে, সেটুকুনু তত্ত্ব আর আবিষ্কার করতে পারছি না। এটা দিয়ে ওটা হয়, ওটা দিয়ে সেটা হয়, সেটা দিয়ে এটা হয়, এইরকমভাবে মিলিয়ে মিলিয়ে একটা ধারা মিলাতে পারি, কিন্তু কেন হয়, কিভাবে হয়, কিসের জন্য হয়, কোন্ সুরে হয়, কে করছে, কিসের জন্য করছে, কিভাবে করছে, কেমন করে করছে, তার আর নাগাল খুঁজে পাই না। অদ্ভুত। যে দেখে, সে দেখতে পাচ্ছে, দেখা ক্রিয়াটা হচ্ছে। যে বোঝে সে বুঝতে পারছে, যে শুনতে পায়, সে শুনতে পাচ্ছে, যে স্বাদ পায়, সে স্বাদ পাচ্ছে, কিন্তু খুঁজতে গেলে কেউ খুঁজে পাচ্ছে না; বলতে পারছে না, কোত্থেকে পাচ্ছি, কেমন করে পাচ্ছি। কেমন করে স্বাদ পাচ্ছি, কেমন করে ঘ্রাণ পাচ্ছি, কেমন করে দেখছি, বলতে আর পারছে না। সমস্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চিরে চিরে দেখলে, টুকরো টুকরো করে দেখলে, তন্ন তন্ন করে বিচার করলে দেখা যায়, সমস্ত মাংসের টুকরো, নাড়ীর টুকরো। সব টুকরো, সমস্ত ধারায় ধারায় বিজ্ঞানে বিজ্ঞানে যুক্তিতে যুক্তিতে অঙ্কে মিলিয়ে মিলিয়ে মিলনের ধারায় একটা সুরের কথা, একটা মিলতির কথা বলা যায়। কিন্তু মিলন হলে মিলতি হলে যে, এই কথাটা সত্য হবে, এই সুরটা বহির্গত হবে, এটা যে দর্শন হবে, দর্শন হলে যে উপলব্ধি হবে, উপলব্ধি হলে যে অনুভূতি আসবে, এই অনুভূতিটা কে উপলব্ধি করছে? সেই উপলব্ধির ব্যক্তিটা কোথায়? জিহ্বায় মিষ্টি পড়লে যে মিষ্টত্বটা উপলব্ধি করছে, এই মিষ্টত্বটা কে উপলব্ধি করছে? সেই উপলব্ধির ব্যক্তিটা কোথায়? যন্ত্রে না হয়, দেহযন্ত্রে না হয় বলে দিল, এই ধাক্কায় এখানে গেছে, ঐখানে গিয়া ধাক্কা খেয়েছে, সেটা brain-এ গিয়ে লেগেছে, ব্রেণ থেকে সেটা পাঠানো হয়েছে। মাথার থেকে এখানে পাঠিয়েছে, এইখান থিকা না হয় ঐখানে পাঠিয়েছে; হাজার রকম না হয় বাহির করা হল। কিন্তু তিনি যে মিষ্টত্বটা উপলব্ধি করলেন, তাঁকে কিন্তু আর খুঁজে

পাওয়া গেল না। কে বুঝলো তাকে যে খুঁজে পাওয়া গেল না, এটাতেই যেন শূন্যের সাথে একটা মিলনের সুর খুঁজে পাওয়া যায়। খুঁজে পাওয়া গেল না, তৃপ্তি পেল। কে তৃপ্তি পেল, খুঁজে পাওয়া গেল না। শুধু বলে দিল, 'বাঃ, বাঃ! কি চমৎকার!' কি দুঃখ, কি ব্যথা বলে দিল। জিজ্ঞাসা করলে কোন্ অঙ্গে ব্যথাটা পেল, কোন্ অঙ্গে লাগলে আনন্দ পেল, সেটা বুঝা গেল। কিন্তু ব্যথা বা আনন্দ কে পেল, সেটা আর বলা গেল না।

কিভাবে স্বাদ পেল, কে স্বাদ পেল, জিজ্ঞাসা করলে বলবে, তাতো বলতে পারবো না। জিহ্বায় চিনিটা লাগলে আমি বলে দিলাম, 'মিষ্টি'। কিন্তু কেমন করে বললাম, কিভাবে বললাম? স্বাদ গ্রহণ করলো কে? সেটা আর বুঝানো গেল না। সেটা বলতে পারলো না। আমার অঙ্গে পড়লো, ভিতর থিকা আপনা আপনি বলে দিল, এটা মিষ্টি, এটা টক। বলে তো দেওয়া হল। কিন্তু কেমন করে বলে দিল, সেটা আমি বলতে পারবো না। চোখ দিয়া দেখা যায়। এটা খারাপ, এটা ভাল; এটা পাহাড়, এটা চন্দ্র, এটা সূর্য, দেখে দেখে বর্ণনা করছো। এগুলো বর্ণনা করছো। কে বর্ণনা করছে, কে বলে দিচ্ছে, কার ভালো লাগছে, সেটা আর বলতে পারছো না। তারে জিজ্ঞাসা করলেও, দেহযন্ত্রকে টুকরো টুকরো করে ফেললেও কার ভালো লাগছে, কার খারাপ লাগছে, খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক সিনেমা দেখার রীলের মত সব হয়ে যাচ্ছে পরপর, পরপর। মনে হয় যেন শূন্যমার্গে এক টেপ-রেকর্ডারের মতন রীল যেন বেজে উঠছে; সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভিতর দিয়ে বেজে বেজে উঠছে। এই যন্ত্রের ভিতর দিয়ে তারই প্রকাশ ঘটছে। কিন্তু সেটাকে আর মহাশূন্যেও দেখা যায় না, আর সেই ব্যক্তিটাকেও খুঁজে পাওয়া যায় না। যেই ব্যক্তিটা উপলব্ধি করছে, যেই ব্যক্তিটা দেখতে পাচ্ছে, যেই ব্যক্তি সুরটা উপলব্ধি করছে, যে চিন্তা করছে, যে আঘাত পাচ্ছে, তাকে তো আর খুঁজে পাওয়া যায় না। এইটাই হল সবচেয়ে আশ্চর্য যে, কোন জিনিসের কোন তৃপ্তিই মিটানো যাচ্ছে না। এতটুকু পেট (belly), দুনিয়ার খাদ্য তাতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, এই পেটটাই ভরতে পারলে না। তোমরা কি ভরতে পারলে বলতো? কিছুই তো ভরতে পারলে না। **এতটুকু এই জীবনটার মধ্যে খাদ্যের সমস্যার সমাধান করতে পারলে না। ঘ্রাণশক্তির সমাধান করতে পারলে না। দর্শন শক্তির সমাধান করতে পারলে না। শ্রবণশক্তির সমাধান করতে পারলে না। একবার ওঠে, একবার ধাক্কা দিয়ে ফেলে আস। একবার**

ক্ষিদে পায়, কিছু গিলে আস। একবার খেলে আবার ক্ষুধা। আবার খেলে আবার ক্ষুধা। এই ক্ষুধার সমাধান তো হল না। ক্ষুধা নিবারণে ক্ষুধার সমাধান তো হয় না। এতটুকু একটা গহ্বর (গর্ত), এটাই বুজাতে (ভরতে) পারলে না। এই গহ্বরই গহ্বর নয়। মহাশূন্যের গহ্বরটা যেন উঁকিঝুঁকি দেয় আমাদের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে। কখনও কামের ক্ষুধা, কখনও চোখের ক্ষুধা, কখনও জিহ্বার ক্ষুধা, কখনও লিঙ্গের ক্ষুধা, কখনও পেটের ক্ষুধা, সব ক্ষুধাগুলি একত্রিত হয়ে যেন মাঝে মাঝে হামাগুড়ি দেয় আর আমরা বেকুবের মতো ঐ ক্ষুধাগুলির ইন্ধন জোগাতে জোগাতে শেষ বেলা বাচ্চা থেকে বার্ধক্য অবধি থাবাথাবি করে ছলচাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনায় নানাভাবে গর্তগুলি ভরতে ভরতে কাটিয়ে গেলাম। কিন্তু জীবনই কাটিয়ে গেলে, গর্ত আর ভরলো না। জিভের ক্ষুধা মিটাতে পারলে না, চোখের ক্ষুধা মিটাতে পারলে না, পেটের ক্ষুধা মিটাতে পারলে না। কোন ক্ষুধাই মিটাতে পারলে না। আর এদিকে কত বেশী ছলচাতুরী মিথ্যা প্রবঞ্চনায় জড়িয়ে থেকে, আরও বেশী অপরাধের বোঝা বাড়িয়ে আর কত কত ব্যথা বেদনা নিয়ে চলতে শুরু করেছ। কিন্তু কি বুঝতে পারছো? ঐ মহাশূন্যের প্রভাব সর্বদাই তোমার ভিতরে প্রভাবান্বিত হচ্ছে। এটাতো বুঝতে পারছো। কারণ কাউকে ভালবাসা শূন্যমার্গের ভালবাসা। সেই শূন্য দিয়েই তো আরেকজনরে ভালবাসছো, শূন্যকেই ভালবাসছো। কি দিয়ে কাকে ভালবাসছো? এই চোখ দিয়ে আরেকজনকে দেখছো। যাকে দেখছো, সে কিন্তু নিজে দেখে না; দেখছে আরেকজনের ক্রিয়াতে। চোখ নিজে কিন্তু দেখে না। জিহ্বারও নিজের স্বাদ নাই। কান নিজে কিন্তু শোনে না। কিন্তু আবার শুনে যাচ্ছে। জিহ্বা নিজে স্বাদ পায় না। কিন্তু স্বাদ পেয়ে যাচ্ছে। ঐ যে ব্যক্তিটা ভালবাসছে, প্রেম করছে কার সাথে? ভালবাসছে কাকে? ভালবাসার কথা কত বলছো। দোকানে গিয়া শাড়ী কিনছো— কত অন্তরের ভালবাসা। কারে ভালবাসতেছ? ঐটারে? যেটারে ভালবাসতেছ, ঐটার মইধ্যে তো কিছুই নাই। কারণ ঐটা তো মরা, dead body। ঐটার মইধ্যে যখন সজাগ হয়, তখন বলে, হ্যাঁ আমি খাই, আমি যাই, আমি ভালবাসি। ঐটার মধ্যে কিছু নাই, কেউ ভালবাসে না। ঐটার মধ্যে কিচ্ছু নাই, চোখে দেখে না, কানে শোনে না, স্বাদ পায় না, ভালবাসে না। খোঁজ নাই— কিচ্ছু ঐটার মইধ্যে নাই। কিন্তু **মহাশূন্যের প্রভাবটা যতক্ষণ আছে, spiring যতক্ষণ আছে, ততক্ষণই পুতুলটা নাচে। তখন তারে তুমি ভালবাসতেছ, সে জবাব দিতাছে। কিসের জবাব কে**

দিতাছে? আর কে জবাব নিতাছে? আর আমরা কিসের আনন্দে নাচানাচি করতাছি, এটা একটা আশ্চর্যের ব্যাপার। দুইটাই যখন যায়, দুইটা dead body একজায়গায় মিশা গিয়া পইরা আছে। দুইটা dead body একজায়গায় পইরা আছে। কে কারে ভালবাসে? দূর ব্যাটা, কেউ কাউরে ভালবাসে না। দুইটাই মরা। ঐটা যখন ভিতরে ঢুকছিল, তখন হ্যা হ্যা হ্যা (হাস্য)। এইখানে গেছি, ঐ করছি, সেই করছি। আবার ঐটা যখন নাই। দুইটাই মরা হইয়া পইরা রইছে। কোনটার মধ্যে কিছু নাই সার বস্তু।

কিন্তু সারবস্তু আছে রে আছে। তোমাদের চোখের সামনে যখন দেখতে পাচ্ছ, তিনি তোমাদের মধ্যেই বিরাজ করছেন। যাঁরে খুঁজে পাও না, তাঁরে তুমি প্রতিমুহূর্ত্তে অসম্মান করছো। ছল চাতুরীতে, মিথ্যায় প্রবঞ্চনায় গলায় দড়ি বেঁধে তাঁকে দিয়ে কাম (কাজ) করাচ্ছ তোমাদের ক্ষুধায়, কামনায়, তোমাদের ইন্দ্রিয়ের যন্ত্রণাকে ভরপুর করার জন্য। বুঝতে পেরেছ? কি অদ্ভুত ব্যাপার। এতবড় বিরাট সুর প্রবহমান তোমাদের মধ্যে, ঐ যন্ত্রেতে যার প্রকাশ হয়। তুমি বললে, 'আমার ক্ষুধা পাইছে'। কেডা কইছে, তোমার ক্ষুধা পাইছে? এই শব্দটা যন্ত্রটা দিয়া তো প্রকাশ করছো। কিন্তু দেহটারে শত কাঁটাছিঁড়া করলেও ঐ শব্দটারে কোথাও খুঁইজা পাইবা না। কিন্তু যন্ত্রে তো কইছে, দেহযন্ত্রে তো কইছে, 'ক্ষুধা পাইছে'। **এই ক্ষুধাটারে পূরণ করার জন্য কত খাওয়া-দাওয়া, রোজগারপাতি, চুরি, চামারি, ডাকাতি কত কি করতাছ, ক্ষুধা, মিটাবার জন্য। দেহটাতো মরা। এই দেহটারে, মরা দেহটারে লইয়া কত কি করতে ইচ্ছা করে। সাজতে গুজতে ইচ্ছা করে। 'আমার সাজতে ইচ্ছা করে না বুঝি। মর মর।' লাগাইয়া দিল ঝগড়া। সাজনের জিনিস পায় নাই বুঝি। দেহটাতো dead-body।** এরজন্য কত কি। যিনি বুঝদার, দেহের মধ্যে বুঝদার যিনি, তিনি বইসা বইসা ভাবছেন, কি বেকুব লইয়া পড়ছি রে। যার মধ্যে আমি আইলাম, বেনারসী পরায় মোটর গাড়ীরে (দেহটারে), আর আমি যে আইলাম, আমার কিছু নাই। আমি যে গাড়ীটার (দেহটার) মইধ্যে থাকি, সেই গাড়ীটারে (দেহটারে) সাজায়; আর আমি যে সুরে সুরে থাকি, সেই সুরে সুর মিলায় না। দেখতেছে আমারে খুঁইজা পায় না। দেখতে গেলে একটাও দেখে না। জিহ্বার স্বাদ বোঝে না, চোখে কে দেখে বোঝে না। কান নিজে শোনে না। এরা দেখতে আছে চোখের সামনে। তাও আমি যে ভিতরে আছি, একটা সুর যে আছে,

এইটা তো বুঝতাছে। তবু দেখ, আমার দিকে নজর না দিয়া দেহটাকে সাজান গুছানো আর কত কি করার দিকে নজর দিছে। সাজাইতেছে, গুছাইতেছে, চলতাছে, ফিরতাছে, বেড়াইতাছে, সিনেমায় যাইতাছে, কত কি করতাছে। V.D.O. Show হবে, চল যাই। কি চমৎকার, কত নাচানাচি। আর ঐ যে সুরটা যার মর্যাদা দেওয়া উচিত, যাকে সম্মান জানানো উচিত, অযত্নে অবহেলায় তিনি দেহের মধ্যে আইট্‌কা পড়ছেন তো। তাঁকে যেখানে নিয়ে বসাচ্ছে, বসে থাকতে হচ্ছে। যা শোনাচ্ছে, তাই শুনতে হচ্ছে, কি অবস্থা।

আসল তত্ত্বের সন্ধান কি আমাদের করা উচিত? যদি দেহের ভিতর খোঁজ পেতে আমার কিছু বলার ছিল না। যিনি নিখোঁজ হয়ে আছেন; খোঁজের সন্ধানের ভিতর দিয়ে, যত্নের সন্ধানের ভিতর দিয়ে যে খোঁজওয়ালা কথা বলছেন, খোঁজের সন্ধান দিয়ে যাচ্ছেন, সাড়া দিয়ে যাচ্ছেন, আমরা তাঁর কথা পাচ্ছি, আমরা তাঁর সাড়া পাচ্ছি এই দেহের ভিতর দিয়ে। তাঁর সাড়া আমরা পেয়ে যাচ্ছি। সেই সাড়াওয়ালাকে আমরা কিভাবে অভ্যর্থনা করবো? কিভাবে আপ্যায়িত করবো? অন্তরঢালা প্রেম ভালবাসা দিয়ে কিভাবে তাঁর মর্যাদা রক্ষা করবো? তা না করে আজ আমরা কি করছি? ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনার ঘানিতে ঘুরিয়ে তাঁকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি। তাই মনে রেখো, তোমাদের ভিতরে যে সুর আছে, সেই সুর কিন্তু তোমাদের দেহযন্ত্রকে আশ্রয় করে আছে। সেই সুর কিন্তু তোমরা খুঁজে পাচ্ছ না। মনে হয়, যেন তোমাদের সুর। সুর তোমাদেরই। কিন্তু অনেকদূর, অনেকদূর, অনেকদূর। দূর থেকে এই সুরধ্বনি বাজাও। বাজাতে বাজাতে এই দূরের সূর কাছে টেনে নিয়ে এস। বাজাও সেই ধ্বনি, সেই সুরধ্বনি। বাজাতে বাজাতে সেই সুর দূরের থেকে কাছে ভেসে এসে তোমার এই দেহযন্ত্রকে স্বাদে সোয়াদে, দর্শনে স্পর্শনে ঘ্রাণে ভরপুর করে তুলবে, প্রাণের ভিতর দিয়ে জাগিয়ে তুলবে; যাহা তুমি এখানে উপলব্ধি করতে পারছো ইন্দ্রিয়ের নানা লালসায় বাসনায় কামনায় তাড়নায়। তখন এই সুরের লালসায়, বাসনায়, সুরের কামনায় ফুটে উঠবে অফুরন্ত সুরের ভাণ্ডার। আর তা থেকে অনন্ত তৃপ্তির ধারা তোমার অন্তরকে ভরিয়ে তুলবে অফুরন্ত সুরের প্রবাহে। সেই তৃপ্তি অনন্ত সুরের ধারায়। সেই তৃপ্তি অনন্ত কাম কামনায়; তৃপ্ত করবে তোমাকে অনন্ত সুর সাধনায়। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

ফাঁকা থেকে এসেছি বলেই সবকিছুই যেন ফাঁকাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে

৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯
বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ক্যাম্পাস
শিবপুর, হাওড়া।

দ্বন্দ্ব, সমস্যায় ভরা মন, কিভাবে হবে তার সমাধান? কি করে বেদের সুর ভেসে এল? কি হবে এরপরে? কেন এসেছ? কি তার প্রয়োজন? ভগবানকে যে ডাক, তাঁর কোন হদিশই তো পাচ্ছ না। নানা প্রশ্ন, নানা জিজ্ঞাসা সর্বদাই জাগছে মনের মাঝে।

২৫/৩০ হাজার বছর আগের কথা বলছি। বেদ তো কোন দেবদেবতার নাম করেনি। সেই বেদের আদিসুরে এসব কোন কথা বলেনি। প্রয়োজন ছাড়া তোমরা আসনি। শূন্যের থেকেই বেদের সুর ভেসে আসছে।

ঋষি বলছেন, খুঁজে পেলাম এক সুর। নিজের ভিতরেই সুরের উন্মাদনায় তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলেন। **জীবজগতে আমরা সবাই এক একটি বীজমাত্র। বীজ পুঁতলে তার বিকাশ হয়, প্রকাশ হয়। স্বাভাবিকভাবে ফুটে বের হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম— জীবজগতে এই পঞ্চভূতের সবারই প্রয়োজন হয়। খাদ্যাভাবে বীজের প্রকাশ জাপ্য থাকতে পারে। কিন্তু ফুটে যখন বের হয়, বিরাট বটবৃক্ষ। বিরাট ক্ষমতা এই বীজের।** না দেখলে বিশ্বাস করবে না। এক ফোঁটা বৃষ্টি বলছে, আমি সাগর। যখন অনেক ফোঁটা একত্র হই, সাগর হয়ে যেতে

পারি। মধুর চাক, মৌচাক হয়ে মুহূর্ত্তে পূর্ণ হল; সমস্ত একত্র হয়ে মূল্য হল। উঠিয়ে দিলে শূন্য হয়ে গেল। পৃথিবী আদিতে মহাশূন্যে অনু পরমানু হয়ে ছিল। অনুপরমানুগুলি একত্র হয়ে হয়ে গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, পৃথিবীর সৃষ্টি হল। শূন্য থেকেই সব। নদীর জলের নীচে মাটি জমে জমে চর হয়। এক গ্রহ থেকে হাজার গ্রহের সৃষ্টি হয়। অনু পরমানুর সমষ্টি, অনু পরমানুগুলি মিলিত হয়ে এক একটি গ্রহ হয়ে যাচ্ছে। এখনও শেষ হয়ে যায়নি। সৃষ্টির ধারাবাহিকতার ধারা আজও অব্যাহত হয়ে রয়েছে।

পৃথিবী থেকে জীবজগতের সৃষ্টি। প্রত্যেকটি জীবন এক একটি বীজ। ফাঁকা, ফাঁকার মধ্যেই এর জন্ম হয়েছে। এই ফাঁকার কোন শেষ নাই, কোন Shape (আকৃতি) নাই। **ফাঁকা চিরদিনই ফাঁকা। আবার ফাঁকার মাঝেই আছে আঁকা। এই ফাঁকা সচেতনে ভরা। ফাঁকার মাঝেই আছে চৈতন্য, আছে সত্তা। অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্রপুঞ্জ ফাঁকার মাঝেই আশ্রয় নিয়ে রয়েছে। প্রতিটি জীবের মাঝে আছে এই ফাঁকারই ইঙ্গিত।** আমাদের জীবনের বিষয়বস্তুকে চিন্তা করলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই দেহের মাঝে কে বোঝে, কে দেখে, কে খায়, খুঁজে পাওয়া যায় না। ফাঁকার থেকে এসেছি বলেই সবকিছুই যেন ফাঁকাতেই লীন হয়ে যাচ্ছে। ফাঁকা, শূন্য ঠিকই আছে। এই মহাশূন্য থেকে সৃষ্ট হয়ে, এই মহাশূন্যকে আশ্রয় করেই গ্রহ, নক্ষত্রপুঞ্জ পূর্ণ হয়ে আছে। কেন সৃষ্টিটা হয়, আজও হয়নি তার সমাধান। মহাশূন্যে সাংঘাতিক একটা গতি পূরণ করার অভিলাষে যেন ভরপুর করতে চাইছে। সেই Speed-টা আপনগতিতে চলছে। এই Speed-টাই চৈতন্য। প্রতি অনু পরমানুতে বিদ্যমান। পরপর চলে যাচ্ছে। কি যেন একটা উদ্দেশ্য রেখে চলে যাচ্ছে। ক্রমে ক্রমে বিকাশ হচ্ছে। অঙ্কুরের মতো ফুটে বের হয়ে যাচ্ছে।

এক মাসের শিশুর তাকানো, হাসির কোন দিশা নেই। ক্রমে বুঝ পেকে উঠছে। ক্রমশঃ ক্রমশঃ বুদ্ধি পাকা হয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা আসছে। যখন জিজ্ঞাসা আসছে, সূত্র ধরে ধরেই আসছে। বাবা যখন আছেন, ঠাকুর্দা নিশ্চয়ই ছিলেন। এইভাবে জন্মের ধারাবাহিকতার ধারায় জীবকুল আসছে। আর মৃত্যুর মাঝে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই জন্ম-মৃত্যুর খেলাই কি শেষ?

যার মধ্যে sense রয়েছে, বুঝ আছে, সব যেন বুঝে বুঝে কাজ করছে। বাগানটাকে ফুলে ফুলে সাজাতে গিয়ে একজন মালির কাজ করতে হয়েছে। সাধারণ বুঝ নিয়েই যেন সব কাজ হয়ে যাচ্ছে। মনে হয়, প্রয়োজনের সাথে সাথে কেউ যেন মিটিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে যাচ্ছেন। তিনি কে? জানি না। কিন্তু তাঁর দূরদৃষ্টি, দূরদর্শনে, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যবস্থায় মুগ্ধ হয়ে যেতে হয়। একদিনের শিশুর জিহ্বায় মধু দিল। শিশু চুষতে শুরু করলো। শিশু বুঝিয়ে দিল, তার জানা ছিল, বুঝ ছিল।

বেদের যুগে ঋষিরা গভীরভাবে চিন্তা করছেন। প্রয়োজনের তাগিদে চিন্তাগুলি আসছে। তাঁরা বলছেন, আমরা এই শূন্যমার্গে আবেদন জানাচ্ছি। সৃষ্টির এই অপূর্ব পরিচয়ে মুগ্ধ হয়ে গেছি। তিনি যেই হোন, অত্যন্ত বিজ্ঞ, অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁদের ভিতর থেকে একটা ভাব এলো আস্তে আস্তে, জগতকে মুক্ত করতে হবে। নিশ্চয়ই কেউ আছেন। কেন আমার প্রশ্ন আসছে? **তিনি নিশ্চয়ই আমাদের ডাক শুনবেন। কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকলে জাগতে পারে না। কোন পশুপক্ষী, মানুষকে তো কোন কিছু স্বাভাবিক বৃত্তির নিবৃত্তির চেষ্টা শিখাতে হয় না। সৃষ্টির বৃত্তির উন্মাদনা, আমার উন্মাদনায় যদি ডাকি, নিশ্চয়ই তিনি ডাক শুনবেন।**

বেদ বললেন, তোমার উত্তর তুমি পাবে। ব্যথা পেলে উঃ করা তো কাউকে শেখাতে হয় না। ব্যথা বেদনার সুরে কেন আমরা এসেছি? দ্বন্দ্ব সমস্যার প্রয়োজন আছে। এগুলি এগিয়ে নিয়ে যায়। সমাধানের জন্যই সমস্যার প্রয়োজন। ঋষিরা বলছেন, আমরা কি বলে, শূন্যের দিকে চিৎকার করবো? বেদ বলছেন, তোমার, সহজ সরল স্বচ্ছ মনে বাচ্চার মতো 'আস, সোনা মনা' বলে মনের ভাব ব্যক্ত করবে। তোমার সুরের সাথে, তোমার ডাকের সাথে অনাদি অনন্ত সুরের ধারা মিলবে। আপনি ডাক বের হবে। মুগ্ধ হওয়া সমস্ত জীবেরই একটা সুর।

বেদের মন্ত্র, বেদের শব্দ শুনলেও কাজ হয় বাবা। হাজার হাজার বছর ধরে তাঁরা চিৎকার করলেন, কোথায় কোথায়। কোথায়? কোথায়? তারপরে তাঁরা বিরাট বিরাট সুরজ্ঞ হলেন।

ক্রমে সঙ্গীতের সাধনায় পর্দা এল, সরগম এল, স্বরলিপি এল। মূলাধার থেকে সহস্রার অবধি গভীর সুরে থাক। **এই সুর বাজাও। বাজাতে বাজাতে ভিতরের উন্মাদনা থেকেই আপনিই সুর বের হবে। আকাশের সাগরকে বোঝ তার গর্জনে বর্ষণে। গভীর নিনাদের ধ্বনি তোমার মধ্যে রয়েছে। রেওয়াজ করে যাও সা সা রে রে গা গা। স্বরলিপির অর্থ বুঝে কে সঙ্গীত সাধনা করেছে? মন্ত্র হচ্ছে ধ্বনি। মনন করা, ধ্বনিকে মন্থন করাই মন্ত্র।**

দেবর্ষি দেহবীণার সপ্তচক্রে বাজাতে শুরু করলেন। তিনি বলছেন বিশুদ্ধে যখন এলাম, আমার সকল চাওয়া পাওয়া লীন হয়ে যাচ্ছে। সপ্ত আলো আমায় ঘিরে ধরেছে। চারদিকে আলো আর আলো। বার্তা আসছে। চারিদিক থেকে আনন্দের বার্তা আসছে। এক অপূর্ব আনন্দে আমার শিহরণ জাগছে। শুধু আনন্দ, আনন্দ, আর আনন্দের অনুভূতি, সেটা আমি কাউকে বুঝাতে পারবো না। এটাই কি চিদানন্দের ঢেউ? দেবর্ষি আনন্দে বিহ্বল হয়ে নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করছেন। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

মহাশূন্যই একমাত্র বলতে পারে আমি জন্ম মৃত্যুর বাইরে। আমার জন্মও নেই মৃত্যুও নেই

১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৭
সুখচর ধাম

ফাঁকা যেমন নিখোঁজ আবার 'আছে'টাও তেমন নিখোঁজ। কে বুঝে খুঁজে পাওয়া যায় না। সাংঘাতিক কথা। কে দেখে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া যায় না। যন্ত্রপাতিগুলো শুধু দেখাচ্ছে, এটার থেকে, ওটা, ওটার থেকে সেটা, সেটার থেকে এটা— এগুলোই চলছে। আসল তত্ত্বটা তো বেরোল না। দেখা ক্রিয়ার মাধ্যমে যে বুঝতে পারা, জিহ্বার মাধ্যমে যে স্বাদ পাওয়া, স্বাদটা বুঝে নেওয়া; কে স্বাদ পাচ্ছে? কে বুঝছে? এই Answer তুমি পাবে না। তবে একটা answer তুমি সবসময়ই পাচ্ছ। এটাই পাচ্ছ, এটা চিরকালই নিখোঁজ। **কেন নিখোঁজ সে হয়েছে? কারণ চিরকাল থেকেই আছে বলে। চিরন্তনই আছে। চিরকালই আছে। কোনদিনও আরম্ভ হয়নি। কোনদিনও এটার starting নাই। start (স্টার্ট) যদি থাকতো, তবে এগুলি (কে দেখে, কে শোনে ইত্যাদি) answer পেত।** answer না পাওয়াটাই যেন বুঝিয়ে দিচ্ছে, চিরকালই যিনি আছেন, এখনও তিনি তোমার মধ্যেই আছেন। সেই 'আছেন'-এর যে 'আছে' সে আবার নিখোঁজ। তিনি নিখোঁজ হয়ে পড়ছেন কিভাবে? সেই ফাঁকাতে। সেই ফাঁকাটাও কিরকম? যার আদি নাই, যার অন্ত নাই। ফাঁকা যেমন কেউ সৃষ্টি করে না, এই 'আছেন' হয়ে যিনি আছেন, তাঁকেও কেউ সৃষ্টি করেনি। ফাঁকাও চিরকাল। আর 'আছেন' যিনি এটাও চিরকাল। এই দুইটি সমানভাবে একই অঙ্গাঙ্গীভাবে মিলিত সুরে চলছে। একদিকে নাই, আরেকদিকে আছেন।

একটা 'আছেন' বললে এটাই সাংঘাতিক, চিরকালের জন্য আছেন। এটাই একমাত্র correct answer। তার কোন আদি থাকবে না, অন্ত থাকবে না। আরম্ভ নাই। শেষও নাই। বুঝতে পেরেছ? তাকে যদি শূন্য বলা হয়, তার নাম 'শূন্য' আপত্তি নাই। এই যে মহাকাশের ফাঁকাটা, সেই যে স্বয়ং কি না, তাও তো বলা যায় না। প্রমাণে বলছে, কি বলছে? দেখ, ফাঁকার যদি শেষ না হয়, 'ফাঁকা' শব্দটা যখনি তুমি ব্যবহার করছো, একটা চোখে তুমি ফাঁকা দেখছো কি না? যখনি দেখা ক্রিয়ায় একটা ফাঁকা আছে, এই ফাঁকাটা কেমন করে আসলো? এতবড় ফাঁকা, এতবড় একটা space কি করে হল? তখনি একটা প্রশ্ন জাগে। শূন্যের যে space সীমানাবিহীন, সীমানাহীন। বলছে যে, এই শূন্যকে তো তুমি স্বীকার করতেছ। একটা স্বীকারোক্তি করলেই 'আছেন'-এর সাড়া পড়ে যাবে। শূন্য আছে কিনা? **শূন্য আছে। মহাশূন্য আছেন, ফাঁকা আছে। ফাঁকা যদি থাকে, সেই ফাঁকা থাকলেই বুঝতে হবে 'আছেন' ছাড়া ফাঁকা থাকে না। 'আছেন' বলেই ফাঁকা। না হলে ফাঁকাও তো থাকা উচিত ছিল না।** ফাঁকাকে যখনই ব্যবহার করবে, যখনই যেকোন বিশেষণ দেবে বা বিশ্লেষণ করবে যেমন, ফাঁকা তো নাই, ফাঁকার তো অস্তিত্ব নাই, ফাঁকার তো কোনকিছুই নাই, ফাঁকা তো শ্রুতির বাইরে, ফাঁকা তো আদি অন্তের বাইরে ইত্যাদি ইত্যাদি। ফাঁকাকে নিয়ে এতকথা বলতাছ। ফাঁকা বলছে, আমার সম্বন্ধে এত কথা বলার তোমার কি প্রয়োজন আছে? আমি তো ফাঁকা, আমাকে নিয়ে এত নাড়াচাড়া করছো কেন? ফাঁকা বলতে গেলেই তো আঁকা হয়ে গেল। সে ফাঁকার কোন রূপ আছে?

এই যে খালি জায়গাটা, এর একটা রূপ আছে বলছে। একটা রূপের বিন্যাস যদি তুমি খুঁজে পাও, 'আছে' রূপেই পাও, 'নাই' রূপেই পাও, তাহলেই তোমাকে স্বীকার করতে হবে 'আছে'। ফাঁকার তো একটা রূপ আছে। এই যে ফাঁকা ফাঁকা ফাঁকা। এরতো একটা রূপ আছে। ফাঁকাটাই তো একটা রূপ। 'নাই' কিছু নাই— এটাই তো একটা রূপ। যেদিক দিয়েই তাকে তুমি বর্ণনা করো, রূপের বিন্যাসে তাকে তোমার ফেলতেই হবে। যদি তাকে রূপে ফেলতে হয়, কই রূপ? রূপ তো না। একে তো রূপ বলে না। তাহলে 'নীল' এই বর্ণটা হতো না। 'নাই' একটা বর্ণ হয়ে গেছে।

'নাই' থেকে এই colour-টা (বর্ণটা) আসবে কেন? সুদূরের থেকে, গভীরতা থেকে আসছে, দূরত্ব থেকে আসছে। তা না হলে বর্ণটা আসবে কেন? আমি যখন 'নাই', এই বর্ণটা আসবে কেন? একটা বর্ণ থাকলেই তো হয়ে যাবে। এই বর্ণটা আসবে কেন? Colour আসবে কেন? আমার colour তো nothing-এর colour. Nothing-এ যদি colour হতে পারে, তবে তা থেকে অনেক কিছুই হতে পারে। 'নীল আকাশ', এই কথাটা কেন আসছে? আমি (ফাঁকা) যখন নাই, তখন 'নীল আকাশ' বলা হচ্ছে কেন? আমি যদি নাই হয়ে থাকি, তাহলে আমাকে 'নীল আকাশ' বলা হচ্ছে কেন? আমি তো নিখোঁজ। আমার বর্ণনাই হচ্ছে নিখোঁজ। নিখোঁজের বর্ণনায় আমার নাম যদি নিখোঁজ হয়, তবে 'আছেন' ব্যক্তি 'আছে' থেকে নিখোঁজ। আমি যা, 'আছেন'-ও ঠিক তাই। যেদিক থেকে তুমি যাও, ফাঁকা, ফাঁকা, ফাঁকা। ফাঁকাটাতো তুমি দেখতে পাচ্ছ। ফাঁকাটাতো তুমি বুঝতে পারছো। **কোন বিষয়বস্তুকে instinct-এর power-এর মাধ্যমে যদি realize করা যায়, তবে বুঝতে হবে সেই বিষয়বস্তুটার অস্তিত্ব আছে বলেই instinct-এর instrument-এর মাধ্যমে সেই বিষয়বস্তুটা অবগত হতে পারছো।** এটাই 'আছেন'-এর সত্তার কথা। ভাষা নাই। দার্শনিকদের ভাষা থাকলে কি সুন্দর ফুটাইয়া তুলতাম। কঠিন। সাংঘাতিক কঠিন। সাংঘাতিক কথা। দার্শনিকের যুক্তিতে কেন, বড় বড় মহাপুরুষরা পর্যন্ত অদ্যাবধি (আজ পর্যন্ত) এটা discover-ই করতে পারে নাই। কেউ discover করতে পারে নাই। সবগুলির গুলিয়ে গেছে। গুলিয়ে গেছে কেন? গুলিয়ে যাবার বস্তু, গুলিয়ে যাবেই। গুলিয়ে যাবার place-এ গুলিয়ে যাবেই। এইটাই তার সত্তা। গুলিয়ে যাওয়াটাই সত্তা। কেন গুলিয়ে যাবে? কেন সে বুঝতে পারবে না? হ্যাঁ, এটাই সত্তা। বুঝতে না পারাটাই সত্তা। নিখোঁজ অবস্থাটাই সত্তা। কে দেখে, না বুঝাটাই সত্তা। যেমন ফাঁকাকে বুঝা যায় না। বুঝা যাকে যায় না, তার ভিতরে সে না থাকলে একথা আসে না। সে 'আছে' বলেই তার সম্পূর্ণ সত্তা, এইটাই তার সত্তা। এই সত্তার পরিচয় কি? বুঝা যায় না। কে দেখে? সেটা বলা যায় না। কে শোনে? সেটা বলা যায় না। কে খায়? সেটা ধরা যায় না। এইটার সাথে ঐটার link দেখা যাচ্ছে। আবার কি বলছো? বাবারে বাবা। আরে বাবা, এটা আবার কি হল? আমি বুঝতে

পারছি। আমি জানতে পারছি। তুমি আবার বুঝতে পারছো, জানতে পারছো, বলছো কেন? এটা তো থাকা উচিত ছিল না।

যখনই তুমি বুঝতে পারছো, যখনই তুমি জানতে পারছো, তখনই বুঝতে হবে, ঐ সবটাই বুঝ। এরমধ্যে সেই বুঝটা আছে বলেই তুমি বুঝতে পারছো। আবার বুঝটা নিখোঁজ অবস্থায় ফাঁকা অবস্থায় আছে। ফাঁকা সত্তাটা আছে বলেই ফাঁকা কথাটার এখানে পরিচয় পাচ্ছ। তাহলে ফাঁকাটা আছেন, চিরকালই আছেন। আবার খুঁজতে গেলে সেই নিখোঁজ অবস্থা। একটা 'আছেন' যদি পাওয়া যায়, তবে সবটা problem solved হয়ে যায়। কিন্তু এইটাই তো সমাধান কেউ করতে পারছে না। এখন বলতে হবে, ফাঁকাটা চিরকালই ছিল। 'ফাঁকাটা হল' বলতে গেলেই প্রশ্নটা এসে যাচ্ছে। সেইজন্য বলতে হবে, ফাঁকাকে কেউ সৃষ্টি করতে পারে না। ফাঁকার আবার সৃষ্টি করবে কি? ফাঁকা চিরকালই ফাঁকা। চিরযুগই ফাঁকা। তার আদিও নাই, অন্তও নাই। সুতরাং তারপক্ষেই সম্ভব এক হওয়া। সে-ই একমাত্র বলতে পারে, আমিই একমাত্র জন্ম মৃত্যুর বাইরে। **ফাঁকা বা শূন্যই একমাত্র declaration দিতে পারে, আমার আদিও নাই, অন্তও নাই। আমার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।** ফাঁকাই একমাত্র এই declaration দিতে পারে। এছাড়া অন্য কেউ এই declaration দিতে পারে না।

কোন বিশ্লেষণে ফাঁকার নাগাল পাওয়া যায় না। কোন কিছুতেই তার নাগাল পাওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য আবার নাগালটা আমাদের জীবনযাত্রার মধ্যে একেবারে সহজসুরে রয়েছে। কিন্তু এমনই ছক ধইরা উঠতে পারতেছে না। এই পরিদৃশ্যমান জগতে প্রকৃতির সহজাত দান হিসাবে যতসব গাছ-গাছড়া, শিকড়-বাকড় যা কিছু serve করে চলেছে বিরামবিহীনভাবে, Individually কেউ কি তা serve করতে পারে? Individually কেউ সেবা কইরা গেল, টান দিয়া শিকড়টা বার করলো, এটা টান দিয়া বার করলো, ঐটা টান দিয়া বার করলো, এভাবে করতে পারে কেউ? এটা কি সম্ভবপর কথা? এইজন্য **মহাশূন্য থেকে, তার সজাগ থেকে, সচেতনতা থেকে বের হয়ে যাচ্ছে সব আপনগতিতে। কারণ মহাশূন্য নিজেই যে সচেতন, এটা মনে রেখো। মহাশূন্যকে 'মহাশূন্য' নাম**

না দিয়ে 'সচেতনে ভরা' এই নামটা দিলে কেমন হয়? মহাশূন্য সচেতনে ভরা। যা দেখ ফাঁকা, সব সচেতনে ভরা। সচেতনে ভরা আছে বলেই সৃষ্টির সব বিষয়বস্তু তার থিকা (থেকে) সচেতনতার সুর খুঁজে পাচ্ছে। যে যেদিক দিয়ে বের হচ্ছে, সব সচেতনে ভরা। সব natural gift হয়ে বের হচ্ছে। ফুল বের হচ্ছে, ফল বের হচ্ছে। কেউ কারও জন্য অপেক্ষা করে না। ফাঁকাটাই সচেতন। ব্যাখ্যা হল ঃ এরে (মহাশূন্যকে) কেউ সৃষ্টি করে নাই। ফাঁকাটাই সে (সচেতন)। **ফাঁকা সবটাই ফাঁকা। ফাঁকাটাই হচ্ছে সচেতনতা। পুরো conscious. নাহলে একটা বীজ কোথায় পড়ে আছে। তা থেকে কি সুন্দর গাছ হয়ে ফুটে বেরোচ্ছে।** খেলা কথা। কিন্তু শূন্যতাটা যে কি, খুঁজে পাবে না। তোমার মধ্যে তোমাকেই খুঁজে পাওয়া যায় না, তাকে কি করে খুঁজে পাবে? তুমি আগাগোড়া দৌড়াদৌড়ি করতাছ। তোমারেই খুঁজে পাওয়া যায় না। শূন্যরে খুঁইজা পাইবা কি কইরা? কিন্তু খুঁজে পাওয়া না গেলেও সে খোঁজের মাঝে রয়েছে। খোঁজের মাঝে পরিপূর্ণতায় রয়েছে। এ অদ্ভুত। মাঝে মাঝে বের করার ইঙ্গিত পায়। কিন্তু ইঙ্গিতটা ধরে রাখতে পারে না। ওদের (বিভিন্ন মতাবলম্বীদের) জড়ানো চিন্তায় আবার এটা জড়াইয়া ফেলায়। তারে (শূন্যরে) জড়াইলেও সে হ্যাঁ করবে না। না জড়াইলেও না করবে না। তারে (শূন্যরে) জড়াইলেও নাই, না জড়াইলেও নাই। জেনে ফেলাইলেও আসে যায় না কিছু। ফাঁকা তো সব। সবই তো ফাঁকা। **তোমার will-টা তোমার, ব্যাস্। তারপর তুমি কি ভাবে আছ, কিভাবে না আছ, সেটা তোমার উপরে ন্যস্ত। সেটা দেখার দরকার নাই। তুমি কি কর না কর কে বলবে? কে দেখবে? বলুনি কেউ নাই। কউনি কেউ নাই।** বুঝলা না কথাটা? আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শুধু খাওয়া খাওয়ির চিন্তা না করে মহাকাশের কথা, মহাশূন্যের কথা, আমার কথা একটু ভেবো

২রা অক্টোবর, ১৯৭৮
সুখচর ধাম

মহাশূন্য, মহাকাশ মহাসচেতনে ভরা। শূন্য হতেই সৃষ্টি। আবার শূন্যতেই লয়। সৃষ্টিতত্ত্বের কথায়, বাস্তবের দিক থেকে সাকারে যারা আছে, তাদের কারও সঙ্গে সূর্যের তুলনা হয় না। সূর্য স্রষ্টা। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তেজ ধারণ করে আছে সূর্য। এই মহাশূন্যে মহাকাশে অগণিত গ্রহ, নক্ষত্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তুই জ্বলছে। সমস্ত গ্রহ, সমস্ত বস্তু তেজে জ্বলছে। যে কোন বিষয়বস্তু যে কোন জিনিস তোমার দৃষ্টিতে থাকবে, শ্রবণে থাকবে, দর্শনে থাকবে, ঘ্রাণে থাকবে— সেটাই 'আছে' বলে মনে করে নিতে হবে।

এই দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ— এই sign গুলি প্রকৃতির থেকে কেন দেওয়া হয়েছে? প্রকৃতি তোমাকে দর্শন শক্তি কেন দিল? কত দূর দূরান্তের গ্রহ নক্ষত্রগুলি কেন তুমি দেখতে পাচ্ছ? এগুলি এতদূরে রয়েছে যে, তোমার দর্শনের (দৃষ্টিশক্তির) বাইরেও তো রাখতে পারতো। তোমার দৃষ্টিতে রাখার তো কোন প্রয়োজন ছিল না। আরও দূরে থাকলে তো তুমি দেখতেই পেতে না। সেগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে তুমি কিছু জানতেও পারতে না। কিন্তু তাতো হয়নি। প্রকৃতি অগণিত গ্রহ-নক্ষত্র, জোনাকির মতো বিন্দু বিন্দু আকারে তোমার চোখের কোণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম সীমানা পর্যন্ত তোমার দৃষ্টির মাধ্যমে ধরে রেখেছে। কেন রাখলো? নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্য আছে।

কি মহৎ তাঁর (প্রকৃতির) উদ্দেশ্য, কি সূক্ষ্ম তাঁর দৃষ্টি, তোমরা বুঝেও কেন বোঝ না? প্রতি মুহূর্ত্তেই তাঁকে (মহাশূন্যকে) ভুল করছো, ভুল করে চলেছো। এই যতগুলি বস্তু তোমার দর্শনে, তোমার দৃষ্টির

সীমানায় আছে, তাদের সঙ্গে তোমার relation আছে, মধুর সম্পর্ক আছে। প্রকৃতির (মহাশূন্যের) প্রতিটি বস্তুই একটির সঙ্গে আরেকটি এক মধুর যোগাযোগের সূত্রে গ্রথিত। একটির সঙ্গে আরেকটি এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ। সম্পর্ক শুধু মুখে মুখে তো থাকে না। এই পৃথিবীতে যখন দেশ থেকে দেশান্তরে, স্থান থেকে স্থানান্তরে যাতায়াতের পথ সুগম ছিল না; যাতায়াতের কোন সহজ স্বাভাবিক পথ যখনও আবিষ্কৃত হয়নি, তখন দূর-দূরান্তরের দেশগুলি তো ছিল। অনেক দূরে দূরে যেসব দেশ ছিল, যাতায়াত করে সেগুলো সম্পর্কে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জানা না থাকলেও জানার মধ্যে তো ছিল। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্রে তুমি যাতায়াত না করলেও, তোমার জানার মধ্যে তারা আছে নিশ্চয়ই। একেবারে অজানা তো নয়। এগুলোর রহস্য তুমি অবগত না হতে পার; কিন্তু এগুলি যে আছে মহাকাশের বুকে, মহাশূন্যের বুকে তাতো অজানা নয় কারও, জানাই তো। এইটুকুনু একটা দেশে যখন তুমি আছ, অন্য কোন দেশে মনে করো, তুমি যেতে পারনি কিন্তু সারা পৃথিবীটা যে বিভিন্ন দেশ নিয়েই, দেশ ছাড়া নয়, অন্যান্য গ্রাম, শহর না দেখলেও, তাতো তুমি জান। একটা দেশ তো তুমি দেখেছো। প্রত্যক্ষ প্রমাণে যেটা প্রমাণিত হয়, সেটা প্রমাণের মধ্যে পড়ে। আজ হোক, কাল হোক অজানা দেশগুলো তোমার জানার মধ্যে আসবেই।

একটা গ্রামে তুমি আছো। তার পাশের পাশের গ্রামে তুমি যেতে পার। ২০ হাজার মাইল দূরে যে গ্রাম আছে, না দেখলেও সেটি প্রমাণে প্রমাণিত। **'আছে' বস্তু যখন 'আছে', তখন যাওয়া সম্ভব হবেই। 'আছে বস্তু' যখন প্রমাণে আছে, তখন সমাধান হবেই। সমাধান বিনে প্রমাণে আসে না— এটাই প্রকৃতির নিয়ম। দূরে দূরে কোটি কোটি মাইল দূরে গ্রহ-নক্ষত্রের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা আপাতদৃষ্টিতে সম্ভব নয়। কিন্তু প্রকৃতি দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে, সম্পর্ক তো রাখছে।** কেন রাখছে? কেন দূর থেকে শেখানোর মত দূর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছে? এর মাধ্যমে প্রকৃতি কি বলতে চায়? কি জানাতে চায়? মহাকাশের বুকে অগণিত আলোকবিন্দু কি শুধু শোভাবর্ধনের জন্য? শোভা একটা আছে বৈকি। মহাশূন্যের তারার (stars) মালা, আলোর মালার শোভা তো নিশ্চয়ই আছে। শুধু

শোভাবর্ধনেই, দৃষ্টির শোভাতেই এই শোভার, এই সৌন্দর্যের শেষ নয়। 'আছে' বস্তু দেখার মধ্যে যদি প্রমাণে থাকে, সেখানে যাবার সমাধান না থাকলে দেখাবার কোন কারণই নেই। দেখাবার কারণই হল, যাতায়াতের সুযোগ সুবিধা আছে, সেটা জানিয়ে দিচ্ছে। কিভাবে আমরা যাব? কেমন করে সেই দূরাকাশে নক্ষত্রের রাজত্বে, সেই অগম্যস্থানে আমাদের যাওয়া সম্ভব হবে? একথা তো আমরা চিন্তাতেও সম্পূর্ণ আনতে পারি না।

প্রকৃতি বলছেন, কেমন করে যাবে? সেটা কেমন করে আমি তোমাদের বোঝাবো বল? তবে জানিয়ে যখন দিচ্ছে, যেতে যে পারবে, সে বিষয়ে সুনিশ্চিত। তোমাদের ভিতরেই সেটা আছে। ভিতরে Parts গুলো সুসজ্জিত হয়ে আছে; জানানোই আছে।

কি সুন্দর সুমধুরভাবে সম্পর্ক রাখছেন প্রকৃতি; তিনি সত্যই পরমাত্মীয়। সকলকে যেন স্নেহের পরশে বেঁধে রেখেছেন তিনি। তাঁরই দেওয়া বুদ্ধি, তাঁরই দেওয়া দৃষ্টি, তাঁরই দেওয়া জ্ঞান, তাঁরই দেওয়া বিচার, তাঁরই দেওয়া সবকিছু দিয়েই তো আমরা তৈরী, আমরা পরিপুষ্ট। কি অকুণ্ঠ স্নেহে, পরমযত্নে প্রতিপালন করছেন তিনি আমাদের। অথচ আমরা কিন্তু তাঁকেই ভুল করি। তাঁকে বুঝতে পারি না। তাঁর সৃষ্টির শতধারায় সহস্রধারায় বিভক্ত হয়ে পরে আমাদের মন। সেই বিচ্ছিন্ন মনকে একত্রিত করে মূলাধারের মূলের যে মূল তাঁকে, তাঁর প্রকৃত উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আর সচেতন থাকতে পারি না। তাইতো বলছি, তাঁর দেওয়া বুদ্ধি দিয়ে তাঁকেই আমরা বুঝতে ভুল করি। আমাদের প্রকৃত আপনজনতো তিনিই। বিশ্বস্রষ্টার সৃষ্টির সুরের অমৃতপরশে তিনি চান সকলকে সুরময় করে রাখতে। তাঁর প্রাণের তারে, অন্তরের ডোরে সবাইকে বেঁধে রাখতে।

আমাদের জিজ্ঞাসার তো শেষ নেই। কেমন করে এই অসম্ভব সম্ভব হবে? কি করে আমরা মহাশূন্যে কোটি কোটি মাইল দূরে যাব? সেই দুরাশার আশা বিরাট আশার মাঝেই ঝুলছে। এই আশা বাদও তো দেওয়া যেতে পারতো। তাতো পারছি না। একটা দুরন্ত আশা মহাশূন্যের শূন্যের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। আগেই তো বলেছি, আশা যখন আছে, সমাধানও আছে। চাঁদে যাওয়া তো অসম্ভবই ছিল। তাও তো সম্ভব হলো।

একটা জায়গায় যাওয়া সম্ভব হলে সব জায়গায়ই যাওয়া যায়। প্রকৃতির সহজ স্বাভাবিক দানে সেরকম একটা বুদ্ধি আপনিই গজাবে; একটা যেকোন উপায়ের আপনিই স্ফূরণ হবে।

নারকেল ফল গাছ থেকে পাড়লেই তো নারকেল গাছ হয়ে যায় না। নারকেল ফলটিকে আলাদা করে রেখে দিলে তার থেকে আপনিই পাতা, গাছ বের হতে থাকে। প্রকৃতি দত্ত আপন শক্তিতে আপন সামর্থ্যে, সহজাতগুণে সে আপনা আপনি বিকশিত হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত সে মাটির আশ্রয় নেয়নি। নিজের আশ্রয়েই যতটা পারে আপনগতিতে আপনসুরে বড় হবার চেষ্টা করে চলেছে। এদিকে ফোঁপড়া বেরিয়ে শিকড় বের হয়ে গেছে। তখন সে যেন ডেকে ডেকে সবাইকে বলতে থাকে; পারিপার্শ্বিককে জানিয়ে দেয়, ''আর আমি থাকতে পারছি না। আমাকে তোমরা মাটিতে নিয়ে যাও।'' এও ঠিক তেমনি। অত দুশ্চিন্তার কারণ নেইতো তোমাদের। **তোমাদের ভিতরে কখন কোন্ শিকড় বের হবে, কোন্ গুণ ফুটে বের হবে, তোমরা জানতেই পারবে না। তখন সেই কোটি কোটি মাইল চলা অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে তোমাদের কাছে। দূর দূরান্তরের গ্রহ নক্ষত্র হয়ে যাবে পাশের গ্রামের মতো।** তাই আজকে যেটা দুরাশা, কাল যে সেটা সহজ স্বাভাবিক নিকট থেকেও নিকটবর্ত্তী হয়ে যাবে না, কে জানে। তাই নিরাশ হওয়ার কোন কারণ নেই।

নিরাশ হলে, হতাশ হলেই যেন মনে হয়, অনন্ত প্রকৃতি, অনন্ত মহাকাশ সবাইকে ডেকে ডেকে বলছেন, তোমরা যা মনে করেছ, ঠিক নয়। আমাকে তোমরা ভুল বুঝো না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত রহস্যের বার্তা যতটা পারি, আমি তো তোমাদের জানিয়ে দিচ্ছি, দেখিয়ে দিচ্ছি। দূরদূরান্তরের নক্ষত্রপুঞ্জ, সেগুলোতো তোমাদেরই ঘরবাড়ী— এঘর সেঘরের মতো। তোমরা হয়তো ভাবছো, ''কোথায়? মহাশূন্যের নক্ষত্রপুঞ্জ গ্রহপুঞ্জ একটির থেকে আরেকটি তো কতদূরে। কেমন করে পারবো? সেখানে যাব কি করে? কেউ তো পারেনি। শুনিনি তো।''

প্রকৃতি বলছেন, সত্যই তো। তোমরা যা বলছো, মিথ্যে তো বলনি। দেখ, একটা কথা। খাওয়াটাই তো বড় কথা নয়। একটা জিনিস খাইয়ে

দিলাম। তার গন্ধ পেলে না। তোমাদের দুঃখ লাগবে না? গন্ধ বিনে খাওয়াটা কি ঠিক হলো? তোমরা বলো না, 'ঘ্রাণেন অর্ধভোজনম্।' তবে? চিন্তা করে দেখ তো, গন্ধ বিনে খাওয়াটা যদি ঠিক খাওয়া না হয়, তাহলে গন্ধটা কি খাওয়া?

তোমরা তো শুধু খাওয়া-খাওয়িতেই দিনাতিপাত করছো। সব সময় (time) চলে যাচ্ছে ওতেই। এগুলো (সৃষ্টিরহস্য) নিয়ে একটু ভাবো? প্রকৃতি বলছেন, আমার কথা একটু চিন্তা করো। আরেকটা জিনিস খেলে, তার কোন স্বাদ পেলে না। খাওয়াটা কি সম্পূর্ণ হলো? স্বাদে সোয়াদে তারিয়ে তারিয়ে না খেলে কি খাওয়া হয়? আবার দেখ, স্বাদটা কি খাওয়া? কিন্তু স্বাদটা যে খাওয়া নয়, তাও তুমি বলতে পারছো না।

আবার মনে কর, কোন জিনিস খেলে তার কোন শব্দ পেলে না। তোমার খারাপ লাগে না? মনে দুঃখ হয় না? কিন্তু শব্দটা কি খাওয়া?

তাহলে চিন্তা করে দেখ, গন্ধটা স্বাদটা শব্দটা কোনটাই খাওয়া নয়। কিন্তু যেগুলোর অভাবে খাওয়াটা ঠিক খাওয়া হয় না, সেগুলো খাওয়া নয়, একথাও বলা যায় না। আহার ছাড়া আহারের সাহায্যকারীও একরকম আহার বৈকি। ঘ্রাণ, দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ আহারের চেয়ে কম কিছু নয়। তাহলে তোমাদের যে এতগুলো দিলাম, তোমরা কখনও তো সেকথা বল না। তোমরা শুধু খাওয়া-খাওয়িই করছো।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা প্রতিমুহূর্ত্তে ভুল করছি। আমরা অজ্ঞ, মূর্খ। একথা যে স্বীকার করতে হয়, আমরা জানি না।

প্রকৃতি যেন বলছেন, আর কোনদিন ওরকম করবে না। আমার দেওয়া জিনিসগুলো সম্পর্কে একটু গভীরভাবে চিন্তা করবে। আচ্ছা, তোমাদের মাথা, মস্তক যাকে বলো, এতটুকু একটা গোল বস্তুতে কত কিছু দিয়েছি বলো তো? তোমরা ভাবো। আমার কথা একটু ভাবো। ভেবে ভেবে আশ্চর্য হও। গভীর থেকে গভীরতর ভাবনায় চলে যাও। আমি তোমাদের কত কি দিয়েছি জানো? ঐটুকু মাথাতে আমি তোমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, বিচার, বিবেচনা, সচেতনতা, বিবেক সবকিছুই তো দিয়েছি। তোমরা আমাকে ভুল বুঝো না।

আমি কি চাই জানো? প্রকৃতি (মহাশূন্য) যেন বলছেন, আমি তোমাদের চাই। আমি তোমাদের আমার করে রাখতে চাই। আমার সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চাই। তোমরা যে আমার কি, আমার কত আপনার, তোমরা জানো না। তোমরা ভুলে যাও। কেন ভুলে যাও আমাকে তোমরা?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। আমরা ভুলে যাই। আমরা অন্যায় করি। তুমি (প্রকৃতি) যে কি, বুঝে উঠতে পারি না। তুমি আমাদের বুঝিয়ে দাও।

প্রকৃতিকে তো এমনি বুঝানো যায় না। তবু যেন রূপকের সাহায্যেই বলতে হচ্ছে। প্রকৃতি নিজেই যেন নিজেকে বোঝানোর জন্য বলছেন, দেখ, এক্ষুনি তো শুনলে আহারের সাহায্যকারী আহারের চেয়ে কম নয়। তোমরা কত কিছু দেখ আকাশের দিকে তাকিয়ে। দেখো ত?

— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা আকাশে অনেক কিছু দেখি।

— দর্শনের মধ্যে যাকে দেখছো, যা দেখছো, তাকে কিছু পাও না?

— আজ্ঞে, পাই তো।

— তারপর যদি কিছু স্মরণ কর, তবে যাঁকে স্মরণ কর, যা স্মরণ কর, তাঁকে কিছু পাও না? সে কেমন করে আছে? কিভাবে আছে? চিন্তার সাথে সাথে তাঁর সাথে একাত্ম হয়ে যাও না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। তাতো হই।

— তারপর তোমরা এই পৃথিবীতে বসে ভালমন্দ বিচার করতে পারছো। **এখান (পৃথিবী) থেকে মহাকাশের গ্রহ নক্ষত্রগুলি কত বড়, কত দূরে তারা (সেগুলো) আছে, তা ভাবতে পারছো। পৃথিবীটাকে তুমি মনে করছো, কত বড়। কিন্তু তুমি যদি মহাকাশের কোন্ সুদূরের কোন নক্ষত্রে থেকে এই পৃথিবীটাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করো, তাহলে হয়তো এই পৃথিবীটার কোন অস্তিত্বই পাবে না।** কারণ মহাকাশের বুকে এই পৃথিবীটা একটা ক্ষুদ্রতম বিন্দুর মতোও নয়।

তোমরা জীবনে নানা জিনিস উপভোগ করো, তাই না? সুন্দর জিনিস, ভাল জিনিস দেখতে ভাল লাগে না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। ভাল লাগে।

— যা ভাল লাগে, তা তোমার প্রাণের সাথে, মনের সাথে জড়িয়ে থাকে না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। জড়িয়ে তো থাকেই।

— যা তোমার প্রাণের সাথে জড়িয়ে আছে, তা চিরদিনই সংযুক্ত। যা তোমার ভাবনার সাথে জড়িত, তোমার ভাবনার সাথে সাথে তুমি তো সেথায় যাও। ভেবে দেখো ত, যাও না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। সেভাবে তো যাইই।

— তবে? তোমার মন তো সেখানে বারি খাচ্ছে। তোমার মন যেখানে ধাক্কা খাচ্ছে, তুমি তো সেখানে যাচ্ছই।

— আজ্ঞে হ্যাঁ। এভাবে তো কখনো ভাবিনি।

— ফুল ফুলগাছে। তার গন্ধ, তার সৌরভ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূর থেকেই তো সবাই ফুলের গন্ধ পায়। পায় না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। তাতো পায়।

— ফুল কি সকলের নাকে নাকে ঘোরে? তাতো নয়। দূর থেকেও তো সবাই বুঝতে পারে, কোন্‌টা হাস্নাহেনা, কোন্‌টা চাঁপা, কোন্‌টা গোলাপ আর কোন্‌টা শেফালী ফুলের গন্ধ? তুমি ফুলের কাছে না গেলেও তোমার মন তো সেখানে যায়। তোমার মনই সেই সুগন্ধ আহরণ করে। করে না?

— আজ্ঞে হ্যাঁ। করে তো।

— ঠিক এইভাবে **তুমি যদি কোন গ্রহের চিন্তা কর, তোমার মন সেই গ্রহে গিয়ে তো পৌঁছে যায়। সেখানে যারা আছে, তারা তোমার সুগন্ধ তো পেতেও পারে। তুমি হয়তো বলতে পার, কই, আমি তো তাদের সুগন্ধ পাই না?** পেলেও তুমি বুঝে উঠতে পারো না। মৌমাছি যেভাবে মধুর সন্ধান পায়, সেভাবে তুমি পাও না। তোমার সুগন্ধ আস্বাদনের যে নাসিকাটি, সেটি এখনও ফোটেনি। তাই তুমি সুগন্ধ পাচ্ছ না এবং পাওয়া যে যায়, তাও জানতে পারছো না। আমি চতুষ্পার্শ্বেই তোমাকে তার প্রমাণ দিয়ে দিচ্ছি। দূরের গন্ধ যে পাওয়া যায়, পিপীলিকা, মাছি, মৌমাছি তার প্রমাণ। ওরা তোমাকে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, এখানে চিনি

আছে, ওখানে মিষ্টি আছে। তুমি হয়তো অবাক হয়ে ভাবছো, 'ওখানে মিষ্টি আছে জানতাম নাতো।' ওরা তোমাকে জানিয়ে দিল। তোমার ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের সাহায্য ওরা করছে। অনুবীক্ষণযন্ত্র যেমন দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য করে, এই পোকামাকড়গুলো অনেকসময় তোমার চোখের সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করে। ঠিক সেইভাবে তোমার মনরূপ সুগন্ধ তোমার চিন্তার সাথে সাথে গ্রহ গ্রহান্তরে চলে যায়। তুমি না পেলেও তোমার সুগন্ধ তারা পেতে পারে তো? তারা হয়তো বিশেষভাবে সচেতন হয়ে ভাবতে থাকে, কোথা থেকে এল এই গন্ধ? কোথা থেকে এল এই মন? এই সুর? তারা সেই বার্তা খুঁজে পাওয়ার জন্য চেষ্টা শুরু করে। যোগাযোগের সূত্র ঐভাবেই আসতে থাকে।

তারপর কোন এক মহাসন্ধিক্ষণে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যোগাযোগ হয়ে যায়। এই যোগাযোগ হতে বাধ্য। যাতায়াতের রাস্তা একদিন আবিষ্কৃত হতে বাধ্য। সূর্যের একটি রশ্মি কত কোটি কোটি মাইল দূর থেকে আসে, চিন্তা করেছ কোনদিন? একটি সরলগতিতে রাস্তা করে নিয়ে আলোকরশ্মি এসে পৌঁছায়। **হয়তো এমন দিন আসবে, যখন আলোকরশ্মির ওপর দিয়ে দুরন্ত গতির সাহায্যে আমরা আলোকের পথ ধরে পথ চলবো। সেই আলোকরশ্মির পথ হবে solid -এর চেয়েও solid. সেকথা এখন হয়তো তোমরা চিন্তায়ই আনতে পারছো না। তবে তোমাদের ভিতরেই দেওয়া আছে সেই শক্তি, সেই সুর।**

কবে হবে? কেমন করে হবে? এই চিন্তায় বৃথা সময় নষ্ট করে লাভ নেই। একদিন আসবে, যখন তোমরাই সব বুঝতে পারবে, জানতে পারবে। তোমরা একদিন আলোর রশ্মির রাস্তা ধরে চলে যেতে পারবে। কখন কিভাবে কার কোন্ দরজা খুলে যাবে, তা তোমরা নিজেরাই জানো না। তখন নিজের নিজের ক্ষমতা দেখে তোমরা নিজেরাই অবাক হয়ে যাবে।

তাই অবিলম্বে শুধু খাওয়া খাওয়ির চিন্তা না করে মহাকাশের কথা, মহাশূন্যের কথা, আমার কথা একটু ভেবো। ভাবতে ভাবতেই আপনমনে আপনগতিতে ভাবনার রাজত্বে তুমি নিজেই পৌঁছে যাবে। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

শূন্য থেকেই সব কিছু সৃষ্টি তিনি পূর্ণ করার জন্যই সদাব্যস্ত

২রা জানুয়ারী, ১৯৯১
সুখচরধাম

Will force চলছে by will. Will চলছে will force-এর মাধ্যমে। Will আবার will কে guide করছে। কে কি, সেটা বলছি না। এটাই হচ্ছে Universe-এর law. একে অন্যের সহযোগিতায় এই বিশ্বজগৎ চলছে। একে অন্যের সহযোগিতায়, একে অন্যের পরিপূরক হিসাবে চলছে সমস্ত জগৎটা। ইচ্ছাশক্তির ইচ্ছাতেই ইচ্ছা। আবার ইচ্ছা ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই পরিচালিত। সুতরাং who is he? সেখানেই আবার আমি এড়িয়ে চলে যাচ্ছি। কারণ সেই ইচ্ছাকেই বলি আমি শূন্য। মহাশূন্যই যাকে বলি শূন্য, শূন্যটাই self-will. সেই ইচ্ছাশক্তি বা যে will রয়েছে মহাশূন্যে, সেই ইচ্ছাটা কোথা থেকে এল? কে ইচ্ছাটা প্রকাশ করছে?

Natural Course-এ, Natural theory-তে শূন্য থেকেই সবকিছু সৃষ্টি। আজকের জগতে সৃষ্টবস্তুর যে সৃষ্টি, সব কিন্তু from 0 (Zero), সব শূন্য থেকে। সুতরাং শূন্যকে যদি পূর্ণ বলে অভিহিত করা হয়, তাহলে ভুল হবে না। কারণ শূন্যের মাঝে একটাই দেখা যাচ্ছে, সে পূর্ণ করার জন্যই সদা ব্যস্ত। সে যে কি, সেটা কিন্তু জানা যাচ্ছে না, বুঝা যাচ্ছে না। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপ দেখে বুঝা যাচ্ছে, very conscious, অদ্ভুত সচেতন। এত সচেতন; তবে তাঁকে সচেতন বললে একজন ব্যক্তি হিসাবে বলা হয়। তখন তাঁকে কে সৃষ্টি করলো, এই কথাটা এসে দাঁড়িয়ে যায়। কিন্তু এই সচেতন সম্বন্ধে যেটা বলা হচ্ছে, তার গুণ প্রকাশ করা হচ্ছে সচেতন বলে। তাই সচেতন বলে বলা হচ্ছে ব্যক্তিহিসাবে নয়, সচেতনওয়ালা একজন, সেই হিসাবে নয়। একজন থাকলে আরেকজন থাকবেই। সুতরাং এই একজনের আরেকজন নাই। কেন নাই? তাঁকে সৃষ্টি করার মতো আওতায় পড়ে না। কেউ তাঁকে সৃষ্টি করলো, সেই আওতায় পড়ে না। কিন্তু আওতায় আবার

পড়ে যাচ্ছে। তবে আমরা তাঁকে কি বলবো? আমরা তাঁকে এই বলবো যে, সমস্ত ফাঁকা জায়গাটা সচেতন। তার মাঝে অনন্তকালের যাত্রী হয়ে চলছে সবাই।

এই যে অনন্তকালের গ্রহনক্ষত্র কোটি কোটি, কোটি কোটি, লক্ষ কোটি বছর যাবৎ পূর্ণোদ্যমে পূর্ণ বেগে মহাশূন্যের পথ দিয়ে চলছে, এর কোন শেষ, তার কোন কুলকিনারা আজও পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি। সুতরাং আবিষ্কার হবে বলে মনেও হয় না। তবু আমরা যে পর্যন্ত জানি, যতটা জানা গেছে, তার থেকেই বলছি যে, অগণিত বৃষ্টি বিন্দু গোণা সম্ভব নয়। অগণিত বালুকণা গণনা করা সম্ভব নয়। গ্রহ, নক্ষত্রও ঠিক তদনুরূপ, গুণে শেষ করা যায় না। গণিতের গণনায় আজও লক্ষ লক্ষ কোটি বছর যাবৎ গ্রহ-নক্ষত্র গণনা করে শেষ করতে পারেনি। যদি per-second-এ হাজার কোটি করে গ্রহ-নক্ষত্র গণনা করা যায়, হাজার কোটি per-second-এ এইভাবে ৫ হাজার কোটি বছর পর্যন্ত যদি গণনা কর, তবে দেখবে, তুমি স্কিপিংই করছো। যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলে, সেখানেই দাঁড়িয়ে আছ। **যাঁর গ্রহ-নক্ষত্র এত, সেই শূন্য সম্বন্ধেই বলছি, সেই শূন্যকেই আমরা ভূষিত করছি চেতনা ও চৈতন্যস্বরূপ। ইনিই চেতনা, ইনিই চৈতন্য, ইনিই সচেতন, এই বলে আখ্যা দিতে বাধ্য হতে হচ্ছে।** কিন্তু যদিও আমরা এমনিতে তাঁর কোন হদিশ পাচ্ছি না। তাঁর কার্যকলাপে, ব্যবস্থায় তাঁকে এই ব্যাখ্যা না দিলে ত্রুটি করা হবে।

এই শূন্যকে দেখা যায় না। কোন বুঝ দিয়ে তাঁকে সীমাতে আনা যায় না। তাঁর সম্বন্ধে অবাক হয়ে থাকা ছাড়া কোন গতি নাই। তাই অবাকের মাঝে অবাক হয়ে আশ্চর্যের সন্ধানে এগিয়ে যাচ্ছি আশ্চর্য বস্তু নিয়ে। আশ্চর্যের বস্তু নিয়ে সেই আশ্চর্যের সন্ধানে যাচ্ছি। অবাক হয়ে যাচ্ছি, যতবার যাচ্ছি। কিন্তু আজও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তিনি কে? কে তিনি? তাই বিবরণে বর্ণনায় এটাই বলছে যে, সমস্ত শূন্যটাই একটা বস্তু। শূন্যটাই একটা বস্তু, এটা নামকরণ করা হ'ল। শূন্যটাই সচেতন। এই সচেতন থেকে সচেতন বস্তুর সৃষ্টি হচ্ছে। এটুকুই শেষ করে দাও। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

এই মহাশূন্য অনাদি অনন্ত ও মহাসচেতন

২৬শে মে, ১৯৮২
সুখচর ধাম

গ্রহগুলো চলছে মহাশূন্যে। অনন্ত কোটি গ্রহ নক্ষত্রের কেউ বসে নেই। শুধু গ্রহ নয়, সবাই ছুটছে দ্রুতগতিতে। এত কোটি কোটি বছর চলে আসছে এই পরিপূর্ণতার পথে। কিন্তু কেউ নিরাশ হচ্ছে না। আর ভালো লাগে না, এই কথা কেউ বলে না। তার কারণ নতুন স্বাদ পাচ্ছে, নতুন রূপ দেখতে পাচ্ছে। নিজেদের নতুন করে বুঝতে পারছে। প্রতি মূহূর্তে মুহূর্তে নব জীবনের স্বাদ উপলব্ধি করছে। সুতরাং হতাশ নিরাশের স্থান নাই। কারুর এগিয়ে যাবার বিরামও নাই। চলছে, সবাই চলছে সবাইকে নিয়া। সবাই যেন একত্রিত হয়ে একটা মহাসভা করেছে। পরস্পরকে বলছে, আয় দেখি, এই অনন্ত মহাশূন্যের গতির ভিতর দিয়ে, সৃষ্টির ভিতর দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে আমরা আমাদের ভরতে পারি কি না। সৃষ্টিও কি অপরূপ। অগণিত সৃষ্টি। প্রতিমূহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হয়ে চলেছে নবরূপে নানা রূপান্তরিতের ভিতর দিয়ে, সেও অসীম। যেদিকে তাকাবে, তার বস্তুকে ধরবে সেদিকেই দেখবে অসীমের সুর রয়ে গেছে। অসীমের বার্তা বহন করে চলেছে। প্রতিটি সৃষ্ট বস্তুই যেন অশেষের গীতগান গেয়ে চলেছে। সুতরাং এর সন্ধান পাওয়া মুস্কিল। তবু চলছে চলার পথের পথিকেরা। **মহাশূন্যের মাঝে এমনি রহস্য এবং যিনি রহস্যময় তিনি যে কে? যদি ধরে নাও একজন রহস্যময় আছেন, তা না হইলে এই রহস্যের সৃষ্টি কি কইরা হইল? সেই রহস্যময় তিনি আপনভাবে আপনচিন্তায় এইভাবে সৃষ্টির ভিতর দিয়া রহস্যময়তার জাল বুনে চলেছেন। প্রতি বস্তুতে বস্তুতে তাঁর চিন্তা, তাঁর মন, তাঁর সুর প্রবাহিত করে অনন্ত গতির পথে চালিয়ে নিচ্ছেন** এবং পরমানন্দে পরম বস্তুর বস্তুত্বে যাতে পরমানন্দ লাভ হয়,

সেটাও প্রতিমুহূর্তে মুহূর্তে প্রত্যক্ষতার ভিতর দিয়ে উপলব্ধি করিয়ে নিয়ে চলেছেন। কোন অপ্রত্যক্ষতার কথা এখানে নেই। তাই সবাই স্বসাধনায় রত। প্রত্যেকেই যার যার গতির উপর দাঁড়িয়ে থেকে গতির পথে চলছে। এই অনন্ত মহাকাশে অগণিত গ্রহ, উপগ্রহ প্রত্যেকে প্রত্যেকের সাথে মধুর সম্পর্ক বজায় রেখে, যার যার কর্ত্তব্যপরায়ণতার ভিতর দিয়ে যে যার কাজ করে চলেছে। জীব জগতের প্রতিটি জীব নব নব রূপের সন্ধানে পরিবর্তনের মাঝে রূপান্তরিত হতে হতে তাদের কাজ করে চলেছে। অনন্ত মহাকাশে অগণিত সূর্য, অগণিত পৃথিবী। একেক সূর্যের under-এ (অধীনে) কত কত গ্রহ উপগ্রহ। এই বিরাট সূর্যের সেই লাভার মত গলিতের মাঝে আছে বিরাট বিরাট ঢেউ। বিরাট ঝড় বইতে থাকে সেখানে। সেই ঝড়ের বুদ্বুদগুলো কত বড় জান? একেকটা কেন কয়েকশো পৃথিবীর সমান বুদ্বুদ ওঠে। লক্ষ লক্ষ মাইল ওপরে উঠে ধপাস্ করে পড়ে। আবার কোনটা কোনটা ছুটে তার আকর্ষণের বাইরে গিয়েও আপনমনে চলতে থাকে। সেখানেও গড়ে উঠছে পৃথিবী, সেখানেও সৃষ্টির বিষয়বস্তু গড়ে উঠছে সেই অগ্নিকুণ্ডর উপর। জ্বলন্ত একেকটা অগ্নিকুণ্ড বিরাট বিরাট। সেই জ্বলন্ত অগ্নির আভায় আশেপাশে কি লাল। বাপরে বাপরে। সূর্যের পাশে কেউ থাকতে পারে? এই তেজ যে কিভাবে আসলো? এই তেজ কোথা থেকে আসলো, আজও হয়নি তার সমাধান। আবার এই তেজ থেকেই দেখা যাচ্ছে জীবের সৃষ্টি। এই সাগর বল, আকাশে মেঘ বল, বাতাস বল এই অগ্নিকুণ্ড থেকেই, এই গ্যাস থেকেই সৃষ্টি হল। কি অপূর্ব। এই আবর্তন বিবর্তনের পথে অনন্তকাল চলছে সবাই এই মহাকাশের বুকে। সত্যিই এর রূপ, এর বিন্যাস তুলে ধরা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। যতক্ষণ পর্যন্ত না জানতে পারছো, বলা তো সম্ভবপর নয়। তার সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে যতটুকু উপলব্ধি করা যায়, ততটুকুনি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। কিন্তু **মানুষ চায় জীব চায় আরও শান্তি। আরও মহানন্দের পথে বিরাজ করতে চায়, বাঁচতে চায়। তাই জীবজগৎ চলছে সেই মহাশান্তির পথে। জীবনের পথে কত ঝড় ঝাপটা, কত আঘাত প্রত্যাঘাত— শেষবেলা হয় অবসান। এই অবসানের পর কি হবে, না হবে, সেখানে রয়েছে No entry.** কিন্তু বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে এই কালে সেই কালের কথা। গতকল্য যেখানে ছিলে, সেই কালের

কথা এই কালে উপলব্ধি করিয়ে দিচ্ছে। তারপরে তুমি কোথায় যাবে না যাবে, এটা হচ্ছে বর্তমানের ওপরে সেটার ইঙ্গিত এবং সেই ইঙ্গিতের বাসনা পরিপূর্ণ করার জন্য যদি কিছু করণীয় থাকে, প্রকৃতির ধারা ধরে ধরেই তা করতে হবে এবং প্রকৃতির ধারার ওপরেই তা নির্ভর করছে। যদি বল যে, এই জীবনেই কি শেষ? আর কোথাও যেতে হবে না? এখানেই সেই খেলার মাত্রা সব জানিয়ে দিচ্ছে। তবু তোমাদের কিছু হচ্ছে না। এই জানার পথে জানতে জানতে যেতে হবে। সেটাই সাধনা। এই গতির সাথে গতি মিলিয়ে অনন্ত গতির পথে যে চলবে, সেটাই হল সঠিক গতি। গতির সাথে তাল মিলিয়ে গতির তালে তালে যে পথ চলবে, সেটাই হল পথ। এর বাইরে যারা চলবে, সেটা সাধনায় পড়ে না। তাই বুঝে বুঝে চলাই নিয়ম। তার জন্যই বুঝ, তারজন্যই বিবেক। বিবেক এইজন্যই দিয়েছে যে, তোমরা বিবেকাধীন হয়ে চল। তবেই খুঁজে পাবে বিবেকের সুর ও সাড়া। তাই নাটকে দেখ না, থাকে বিবেকের গান। বিবেককে সাথী করে পথ চল। প্রকৃতির গ্রন্থই হল সবচেয়ে বড় গ্রন্থ। এটাই হল বেদ। এখানে নেই কোন ভেদাভেদ। সবাই সমসূত্রে গাঁথা। সমস্ত গ্রহ উপগ্রহ সবাই মনে হয় যেন সূতা দিয়ে গাঁথার মত গাঁথা। এক যোগসূত্রে গাঁথা আছে বলেই যোগ। এই যোগাযোগেই হল যোগ। এই যোগ হল সাধনা। যোগাভ্যাস কথাটার অর্থ কি? সেই যোগাভ্যাসের সাধনা কর। যেই যোগাযোগের সূত্র ধরে তোমরা রয়েছ, সেই যোগাযোগের সূত্র ধরে ধরে তোমরা চল। তবেই পাবে তাঁর সন্ধান। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমরা চিরমুক্ত, চিরজাগ্রত। মুক্তির সন্ধানে শুধু মুক্ত হয়ে আছি

৪৬ নং ভূপেন বোস এ্যাভিনিউ, শ্যামবাজার, কলকাতা
২রা আগষ্ট, ১৯৫৯

শূন্যবাদ সম্বন্ধে কে যেন জানতে চেয়েছিল? সেদিন বুধবার (২৯.০৭.১৯৫৯), সত্যেন বোসের সঙ্গে শূন্যবাদ সম্বন্ধে আলাপ হয়েছিল।

শূন্যবাদের কথা বলতে গেলেই বুঝতে হবে, যে জিনিসের আদি খুঁজে পাওয়া যায় না। ধর্ম কর্ম শাস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে এক একজন একেকভাবে আছে। এক একজন একেকটা মেনে কাজ করে যাচ্ছে। তাদের মাঝে কেহ energy, কেহ আবার matter বা বস্তু মানে। যখন পাহাড়ে ছিলাম, একজনের ১০০-র বেশী বয়স হবে, বেদান্ত নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন, তিনি ব্রহ্মপন্থী। তাঁর ছাত্র-ছাত্রীরা প্রত্যেকেই মহাপুরুষ। তাদের চেহারাও বন্য জন্তুর ন্যায় হয়ে গেছে। আমার তখন বয়স অল্প।

তিনি (সেই ব্রহ্মপন্থী) অনর্গল ছন্দে বলে যাচ্ছেন। তিনি বিদ্যা ও পাণ্ডিত্য হজম করে ফেলেছেন। অনর্গল শ্লোক বলে যাচ্ছেন। তিনি বলছেন, আমরা এমন একটা সত্তায় চলে যাবো, যেখানে সব পাওয়া যায়। ইংরাজীতে কেহ তাকে energy (এনার্জি) বলে, কেহ matter বলে। আমরা এমন একটা বস্তু পাবো, যা দিয়ে সবকিছু আয়ত্ত করা যায়। ত্রাটক, প্রাণায়াম করে তিনি এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছেছেন, যেখানে হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে।

আমি (শ্রীশ্রী ঠাকুর) যে জন্মগত এটা সেখানে প্রচার হয়ে গেছে। তারা আমাকে ধরে নিয়ে গেছে।

তিনি (ব্রহ্মপন্থী) বলছেন, আমি যে আছি, আমি বুঝতে পারছি না। তুমি কি বুঝেছ বিশ্বরহস্য সম্বন্ধে বুঝিয়ে দাও। তুমি যে বিশ্বতত্ত্ব বুঝেছ, আমায় বলো। তারা লিখতে বসলো ভোজপত্রে (ভূর্জপত্রে)। এভাবে লেখে না। এভাবে লেখে হাতমুঠো করে।

আমি বললাম, ... বেদমন্ত্র। দেখো, যে জিনিস দেখছো, সেটা প্রকৃত দেখা নয়। **যে জিনিস খাচ্ছ, সেটা খাওয়া নয়। বস্তুর রূপ যে দেখছো, তা প্রকৃত রূপ নয়। রূপে রূপে রূপান্তর, সব নামে অভিহিত। বস্তুবাদের উপর ভিত্তি করে বস্তুর বস্তুত্ব নিয়ে একদিকে যদি যাওয়া যায়, বস্তু খুঁজতে খুঁজতে জাগতিক সমস্ত বস্তু এসে উপস্থিত হয়। কতটুকু বস্তু আর আবিষ্কৃত হয়েছে? এই অনন্ত বস্তুর নাম জানা আজও সম্ভবপর হয়নি। এই বস্তুবাদই ভগবানবাদ।** ভগবানের আলাদা কোন রূপ নাই। এই সমস্ত বস্তু নিয়েই জগৎ বলো, ভগবান বলো, যা কিছু বলো, সব। তারপর তুমি বস্তুও খুঁজে পাবে না। শূন্যে কিছুই থাকে না। কিছুই থাকে না, তাহাই শূন্য নামে অভিহিত। সকলে মহাশূন্যে ভাসমান থাকে। এই যে আলোড়ন হচ্ছে, সূর্য চন্দ্র, জগৎ পরস্পরের আকর্ষণে ঘুরছে, এই আকর্ষণের, এই আলোড়নের আদি কে? সূর্য আর একটি সূর্যে মিশে যায়; যেমন পিতা আছেন, তার বাবা আছেন, তার বাবা তার বাবা করতে করতে কোথায় চলে যাওয়া যায়। আমরা পৃথিবীর বুক হতে এসেছি, আবার পৃথিবীতে মিশে যাব। এই জীবলোক যদি পৃথিবীতে মিশে যায়, আবার পৃথিবী সূর্যে মিশে গেলো; সূর্য আর একটি সূর্যে মিশে গেলো। এইভাবে মিশতে মিশতে চলেছে অনন্তকাল ধরে। কারণ একটা থাকলে আর একটা আছে। সূর্য আবার আর একটিতে মিশে গেলো। এইভাবে চলতে চলতে অগণিতে চলে যাবে। আজও হয়নি তার সমাধান। যদি বলো, এটা চিরকাল ছিল, তা বললে হবে না। প্রতিটি বস্তুই অনন্ত বস্তুর সংমিশ্রণে পরিবর্ত্তনের মাঝে পরিবর্ত্তিত অবস্থায় নানা রূপ নিতে নিতে চলেছে। সূর্য, এটা তার নিজস্ব রূপ নয়। সন্তান আছে যখন, পরবর্ত্তী আবর্তনের মাঝে আর একটি রূপে আছে। সূর্য যখন আছে, আর একটি থেকে এসেছে। বাতাসে Oxygen আছে। ধরো, তোমরা ১০০-টির নাম জানো। ১০০-র যে একটি, তাও তো ১০০টি হতে একটি একটি করে আর একটি।

বাবা খুঁজতে গেলে তার বাবা, তার বাবা করে করে মানুষ শেষ হয়। তারপর শুরু হয় জীব ও পোকা-মাকড়। তাও শেষ হলো, তবুও বাপ খুঁজে পাওয়া যায় না। সব পৃথিবী শেষ হয়ে যায়, তবুও না। এই ধাতু গলিত পৃথিবী হতে; বীর্যের নাম আর একটি ধাতু বলতে হয়। জীবলোক যদি পৃথিবী হয়ে যায়, পৃথিবী যদি সূর্য হয়ে যায়, এমন অনন্ত অণু পরমাণু অনন্ত ঢেউয়ের মাঝে

আলোড়িত হচ্ছে। নদী হতে যেমন চর পড়ে বিরাট দেশ হয়ে যায়; **ঢেউয়ের স্রোতে স্রোতে বালুকণা জমে জমে বিরাট দেশ হয়ে যায়। ঠিক তেমনই মহাশূন্যে অনন্ত অণু পরমাণুর আলোড়নে এক একটি ভূলোক, ভুবঃ লোক, মহলোক এসে উপস্থিত হলো। পৃথিবী গণনা করা সম্ভব নয়— এত অগণিত পৃথিবী হলো। একটা বস্তু থাকলেই, সেটা আর একটা হতে আসে, ইহাই স্বাভাবিক।** সব যখন মিশে গেল একটায়, সেই এক কোথা হতে এল? এককে আধা (অর্দ্ধেক), সিকি (চারভাগের এক ভাগ), আরও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ করো। মিনিট, সেকেন্ড হতে অনন্ত কোটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ (বাট) করা যায়, আরও কত অংশ করে ভাগাভাগি করা যায়, তবে সেই এক, এক-এর নাম না হয় ভগবান হলো। এই এক কোথা হতে এল? আমাদের নাক, মুখ, চোখ, কানওয়ালা ভগবান কোথা হতে এলো? এদেশের ভগবানের ছেলেপিলে সংসার সবই যখন আছে, ভগবানের ভগবৎ সত্তা কোথা হতে এল? আমাদের ভগবান বলে যাঁদের এখানে বলছেন, তাঁরা মাতৃযোনি হতে বহির্গত হয়েছেন। সাধারণের ন্যায় তাঁদের রোগ, শোক, দুঃখ ছিল। সাধারণের মতো তাঁরা মৃত্যুকে বরণ করেছেন। কেহ জলে পড়ে মরেছেন, কেহ আমাদের মতো রোগে সাধারণভাবে। তাঁদের ঠিক আমাদেরই মতো রোগ, শোক, দুঃখ-যাতনা ভোগ করে চলে যেতে হয়েছে। তাঁদের আমাদের হতে বিশেষ করে আলাদা ভাববার প্রয়োজনীয়তা নেই। তাঁরা আমাদেরই মতো ঝগড়া বিবাদ করেছেন। তাদেরও বাপ মা ছিল। **ভগবান সৃষ্টি করতে বাপের দরকার হয়েছে। কাজেই যেখানে মূত্রস্থলী, সেখানেই সব দেবতার আসন, সেখান হতেই সব। তবে ভগবান আর মানুষের মধ্যে কি পার্থক্য আছে, জানা দরকার।** একই রক্ত-মাংসের শরীর-উভয়েরই, তবে পার্থক্য কোথায়? এই সাধারণ বুদ্ধি দিয়েই জানিয়ে দিতে হবে। আমরা সবাই এক পর্যায়ে; এক জল, এক বাতাস, এক সূর্যের উপর নির্ভর করছে সবাই। তবে হতে পারে রাজবাড়ির ছাগলের আহার জুটছে ভালো, কাজেই চেহারা ভালো।

অদৃষ্ট সাজানো জিনিস নয়। অদৃষ্ট হচ্ছে দৃষ্টির বাইরে যেটা, সেটাই অদৃষ্ট। দৃষ্টির বাইরে ছিল যেটা, সেই জিনিসকে দৃষ্টিতে আনবার চেষ্টা করেছিল। সেই অজানা বস্তুকে দৃষ্টে আনাই হচ্ছে সাধনা। সেই সূক্ষ্মকে স্থূলে এনে জেনে নেওয়াই হচ্ছে সাধনা। তোমার চক্ষুর আড়ালে ছিল বলেই সূক্ষ্ম নাম নিয়েছে।

দৃষ্টির গোচরে এলেই তা স্থূল হয়ে গেল। একে Energy, matter যা ইচ্ছা বলো। এখান হতে লন্ডন (London) পর্যন্ত শূন্য বসিয়ে গেলে, আগে এক দিলেই শূন্যের মূল্য হয়ে যায়; নতুবা নয়। কিন্তু যদি জগতের অস্তিত্বই না থাকে, তবে কোথায় যায়? খুঁজতে খুঁজতে একে পৌঁছালাম। অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবী যখন এক হয়ে গেল, বস্তু নামে যখন অভিহিত হলো, তখন আর একটি আছে। কিন্তু এই 'আছে'র আছে খুঁজে পাওয়া যায় না। 'আছে'র আছে খুঁজতে খুঁজতে বেদিশ হয়ে যায়। **'আছে'র আছে যখন অস্তিত্ববিহীন হয়ে যায়, তখন কার উপর আস্থা রাখবে? যদি আস্থার উপর আস্থাই না করতে পারো, যদি আস্থার উপর অবস্থান না করতে পারো, অস্তি যদি অস্তিবিহীন হয়ে যায়, এই জগতের foundation-ই যদি না থাকে, তবে কি করে চলছি?** আবার 'আছে' বলে বলছি। 'আছে' বলে মনে হচ্ছে।

একদিন একটি লোক ঘুমিয়ে রয়েছে। স্বপ্ন দেখছে, বিশাল রাজত্ব শাসন করছে। পালঙ্কে শুয়ে শুয়ে স্বপ্নে দার্জিলিং গিয়ে বিবাহ করলো। (স্বপ্নে) সেখানে ঘুমালো। সেখানে স্বপ্নে দেখছে, টিবেটে (তিব্বতে) রাজ্য শাসন করছে। ঘুমাচ্ছে কিন্তু এখানে, সে কিন্তু পালঙ্কে (স্বপ্নের মাঝে) রাজা হয়ে বসে আছে। টিবেটের স্বপ্নের কথা দার্জিলিং-এ বলছে, টিবেটে ঘুম ভাঙার পর। সবই কিন্তু স্বপ্নে চলছে। আমরা আজ এই যে কথা বলছি, আমরা কোন্ পালঙ্কে শুয়ে আছি? হাজার হাজার জগতে স্বপ্নই থেকে যাচ্ছে। যখন আমরা জাগি, হয়তো বা স্বপ্নেই আছি। Dream (স্বপ্ন) কে বুঝে? 'আছি' বলে যে মনে করছি, কিন্তু আদিই যদি খুঁজে না পাই, কোথায় আছি? সব শূন্য হয়ে যায়। এই শূন্যের মূল্য তখনই হয়, আগে ১ থাকলে।

হদিশের বেদিশ হয়ে গেছে বলেই অবাঙ্মানসগোচর, গুণাতীত, ভাবাতীত ইত্যাদি ব্যাখ্যা দিয়ে, অতীতের অতীত করে ছেড়ে দিয়ে, ঐ স্তর বাদ দিয়ে পরবর্তী স্তর হতে (শঙ্কর, গৌরপাদ, বুদ্ধ) বক্তব্য আরম্ভ করলেন। তাঁদের সীমাবদ্ধ চিন্তাধারা দিয়ে, ক্ষিতি, অপ্, তেজের ভিতর দিয়ে বস্তুবাদের নাম দিয়ে বস্তুত্ব খুঁজতে গেলেন। কিন্তু বস্তু ছাড়িয়ে খুঁজতে গেলে কিছুই থাকে না, সব নামে অভিহিত হয়ে যায়। আবার নামে অভিহিতও থাকে না। যে বুঝে সেও থাকে না। সব কিছু মহাশূন্যে একাকার হয়ে মিশে যায়। **বৃত্তির নিবৃত্তি করা সম্ভব হয় না। বিশ্বের সবকিছু খেয়ে ফেললেও আমাদের গহ্বর (উদর)**

পূরণ হয় না। এই মহাশূন্যের বিরাট গহ্বরে আমরা আছি। তারই influence (প্রভাব) আমাদের মধ্যে বিরাজমান। আবার আমরা 'আছি' বলে মনে হচ্ছে। কেননা আমরা চিৎকার করছি, ব্যথা পাচ্ছি, বুঝতে পারছি বলে মনে হইতেছে। এই যে মনে হইতেছে বলে মনে হচ্ছে, এই মনে হওয়াটাও মনে হইতেছে।

বাড়ির পাশের খাল দিয়ে জল গিয়ে নদীতে পড়ে। তখনও তার এপার ওপার দেখা যায়। কিন্তু সেই জল সাগরে পৌঁছালে আর ওপার দেখা যায় না। বস্তুর বস্তুত্ব খুঁজতে খুঁজতে সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে শেষ স্তরে পৌঁছে দেখা গেল, মনে হইতেছে অস্তিত্ব নেই, আমিও নেই, তুমিও নেই। সেই স্তরে পৌঁছলে বস্তুর বস্তুত্ব থাকে না, অস্তিত্বের অস্তিত্ব থাকে না। একেবারে নিরবচ্ছিন্ন শূন্য। এই শূন্যই নামে নামে অভিহিত, এই শূন্যই জীবলোক নামে অভিহিত। এই যে সব নামে অভিহিত, এটা শুধু ধরে নেওয়া, শুধু বলা হিসাবে বলে যাওয়া।

সাধকের জিজ্ঞাসা, তাহলে কি কিছুই করবার দরকার নেই আমাদের?

আমি বলি, যদি তোমার দেবতা, ভগবান থাকেন, সমস্ত সত্তা এমন পরিপূর্ণভাবে পূর্ণত্বের সুর দেবে যে, সেটাই পূর্ণের অবস্থা, এটাই ব্রহ্মের অবস্থা। এই মতকে পথ করে সব বস্তুকে মিশিয়ে দিয়ে ফাঁকা করে মিলিয়ে দিলাম। তাতে বিদ্যার বুদ্ধির শুধু পরিচয়। অণিমা, লঘিমা ইত্যাদি যদি কেহ বিশ্বাস করে থাকে, তবে এসব দিয়ে মহাশূন্যের মাঝে লীন হয়ে লীন অবস্থায় থাকতে হয়। এই নাই-এর সুরে সুর দিয়ে চলছি। আবার 'আছি' বলে যখন মনে হয়, অবাক হয়ে চেয়ে থাকি।

বস্তুবাদের ভিতর দিয়ে সাধক তোমরা নির্বাণ চিন্তার জন্য অস্থির হও। আর আমার নির্বাণের, মুক্তির প্রয়োজনীয়তা নেই। **আমরা চিরমুক্ত, চিরজাগ্রত। আমরা মুক্তির সন্ধানে শুধু মুক্ত হয়ে আছি। এরা শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, নিত্য। ওদের সংস্কার নেই। ওরা যদি মুক্ত অবস্থা হতে আসে, মুক্তিতেই লয় হবে। সমস্ত জীবলোক মুক্ত। পাপ-পূণ্য কোন কিছু স্পর্শ করতে পারে না।** সেই ধর্মে তোমরা প্রতিষ্ঠিত। সেই মন্ত্র নিয়ে তোমরা শুধু এই বলবে, 'আমরা শুদ্ধ, মুক্ত'। এই মন্ত্রই তোমাদের। ধ্যায়েৎ শূন্যম্ অহর্নিশম্। যখন মানুষ চিন্তার মধ্যে যায়, হাত বাড়িয়ে ফাঁকার মধ্যে থেকে শূন্যের মাঝে চলে যায়। সেই ধর্মের চর্চা করে বোলের বোলকে বলীয়ান করে, সেথায় তানের সঙ্গে তান মিলিয়ে,

তানে মানে টানে যখন একমাত্রা হয়ে যাবে, তখন তোমার সুর আর নেই। আদির সুর যে একসুরে আছে, তখনই বুঝতে পারবে।

বুধবার সত্যেন বোস (বিজ্ঞানী, জাতীয় অধ্যাপক) এসেছিল। শূন্যবাদের একটু শুনে বাড়ী নিয়ে গেল। ওর চিন্তার প্রখরতা আছে। বুঝবার যন্ত্রটি ভালো আছে ওর। সে বলেছে, এটা গভীর চিন্তার দ্বারা বুঝতে হবে।

এই যে আজ মহাশূন্যের, এই বিরাট তত্ত্বের অ আ বললাম, তারপর যখন ই ঈ-তে আসবো, টলায়মান হবে। এমন জিনিস দিচ্ছি, যা অতুলনীয়। **একঘর টাকা, একটা চেকে যদি দেওয়া যায়, দশ কোটি টাকাও পকেটে নেওয়া যায়। যেমন অনন্ত বিশ্বের শক্তিকে একটা বিন্দুতে নিয়ে নেওয়া যায়। লম্বায় দশ হাজার মাইল একটা সুতোর বিশ্ব ঘুরতে যা সময় লাগে, একটা বিন্দু ঘুরতেও সেই সময় লাগবে।**

এমন একটা জিনিস (মহাশূন্যের তত্ত্ব) তোমাদের সম্মুখীন করছি যে, তাতে রসকষ কিছু নেই। শুধু একটা কষ্টিপাথর— যেটা সব খুলে দেবে। দেখতে ভালো মানুষ, X-ray-তে কঙ্কাল নিয়ে আসে। তোমাদেরও এমন একটি যন্ত্র দেবো, সেই X-ray যন্ত্রে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে যাবে সব এবং তখন ফুটে উঠবে তোমাদের ভিতরকার সব জিনিস। জেগে উঠবে ভিতরকার সুর। তখন বুক ফুলিয়ে হাঁটবে। এমন কান্নাকাটির আর প্রয়োজন হবে না। আমাকে আর বিরক্ত করবে না, 'ঠাকুর আর পারছি না', বলে। সকলে বলবে, খুব ভাল আছি।

আমরা সব একই স্কুলে আছি। সেখানে ভগবান কি আর ছাত্রই বা কি? Professor বা Student কিছু নেই। কাঁঠাল মিষ্টি কিন্তু বীজটা তিতা। বাবা যদি ছেলেকে বলে, 'বীজটা পোঁতো' (পুঁতে দাও)। শিশু হলে কি হবে? যাকে **শেখানো যায়, তার ভিতরেও শিখবার যন্ত্র আছে। প্রত্যেকের মধ্যে শিখাবার বৃত্তি আছে বলেই ভগবানের ভগবৎ সত্তা সুপ্রতিষ্ঠিত। যাকে তুমি ভগবান বলছো, সে কাঁঠাল আর তুমি বীজ।** ভাওয়ালের (পূর্ববঙ্গের অধুনা বাংলাদেশের একটি স্থান বিশেষ) কাঁঠালের সব গাছই শিয়ালের বিষ্ঠা হতে। অশ্বত্থ গাছ দেখো, কাকের বিষ্ঠা হতে। ক্লাস ওয়ান, টু, টেন (প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, দশম শ্রেণী) কেবল নামে অভিহিত, নামে পার্থক্য। ক খ গ ঘ বাদ দিয়ে কিছু

নয়। এই ক খ গ ঘ নিয়েই জান ফাটাফাটি। আবার আমি কি তোমার? তুমি কি আমার? সবই এই ৩৬টা অক্ষরেরই মার প্যাঁচ। অক্ষর কয়টাই আসল। দেখবে, বীজটা ঠিক আছে কিনা, কে শ্রেষ্ঠ, কে ভগবান, সেটা পরবর্তী কথা।

ছোটবেলায় আমার ধারণা ছিল না যে, কোনদিন কাগজে লিখবো। সব লেখাই হতো কলাপাতায়। ক লিখতে কলাপাতা ছিঁড়ে যায়। আমরাও কলাপাতায় লিখছি। বহু কলাগাছ ছোট ছোট রুয়ে (পুঁতে) দিয়েছিলাম। তারপর উপরের ক্লাসে গিয়ে কাগজে লিখলাম। যারা বড় বড় কবি সাহিত্যিক হয়েছেন, এই ৩৬টা অক্ষরেরই মারপ্যাঁচে। এই অক্ষরগুলিই আসল। কোনমতে ভাবটা ভাষায় ফুটিয়ে তোলা হয়। কে ভগবান চিন্তা করবে না। কে বড় কে ছোট চিন্তা করবে না। ভগবান যাঁরা, বড় যাঁরা, তোমরাও তাই। এক ভাব, এক জাত। কেউ ফল, কেউ বীজ।

হিন্দুদের মধ্যে ৩৩ কোটি দেবতা বাটাবাটি (ভাগাভাগি) হয়ে গেছে। প্রমাণপত্রের অভাবে যে যা ইচ্ছা, তাই করছে। ধর্মের নামে ব্যবসা চালাচ্ছে। মানুষের দুর্বলতার সুযোগে ধর্মীয় সেন্টিমেন্টের সুযোগে ইচ্ছামতো slow poisoning করছে, ব্রিটিশরা জেলে কয়েদীদের যেমন করতো। কোনটা শনির injection, কোনটা রাহুর injection, দেবতাও সব ইচ্ছামতো। গয়ায় গিয়ে পিণ্ড দিচ্ছে। বাবা মারা গেলে মন এমনিতেই দুর্বল থাকে। পাণ্ডারা বলছে, ঐখানে প্রণাম করো, সেখানে প্রণাম করো। আবার একজন বলছে, 'দাও ছয় আনা পয়সা। তা নাহলে বাবা উদ্ধার হবে না'। অবশেষে যখন সব উপায়ই শেষ, একজন ঝাঁটা নিয়ে বসলো। সে বলে, 'দেখি, ঝাঁটার বাড়ি খেয়েও ঠিক থাকো কিনা। বাবার উদ্ধারের জন্য ঝাঁটার বাড়ি খেতে পার কিনা'। এটা একেবারে রাঁচির গারদের কারখানা হয়ে গেছে। কারণ কোন প্রমাণ দিতে পারছে না কেউ। এই কারণে দেশের দুর্দিন হয়ে গেছে। আমাদের ভিতর সংস্কারের ফোঁড়া হয়ে গেছে। জ্ঞানের Instrument-এর দ্বারা অজ্ঞানের পিক (পুঁজ) বার করতে হবে। জ্ঞানযন্ত্রের দ্বারা operation করতে হবে।

আমি এই দেশের লোক, Operation-এর যন্ত্র নিয়ে এসেছি। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) ১৪২, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা - ৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী পল্লী (পার্ক) বেহালা, কোল - ৩৪
ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) কোলকাতা বইমেলা।
৮) অনির্বাণ - মা সারদা কমপ্লেক্স, রাজপুর, সোনারপুর, ফোন-২৪৭৭-৬৫৬৬
৯) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
১০) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Dularpar, P.O.- Makhanpur
Dist.- Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন ঃ- ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৫) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা - ৭০০০৮৪
১৬) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন ঃ- ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, সীতারামপুর, ওয়েন্ট এন্ড, জি.টি.রোড,
আসানসোল, ফোন ঃ- ০৩৪১-২৫১৫০৬৬

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪

বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্ এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪